"ও আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি।"

লেখক পরিচিতি

পূর্ব বাংলার তরুণ উপন্যাসিকদের মধ্যে শওকত আলী প্রথম শ্রেণীর অন্যতম একজন। অত্যন্ত কৃতি ছাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে এম. এ পাশ করে বর্তমানে জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনায় কাজে নিযুক্ত আছেন।

PINGAL AKASH

By :

Sawkat Ali

Rs. Five Only.

পিঙ্গল-আকাশ

শওকত আলী

হ রফ প্র কা শ নী

এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলকাতা-১২

আমার সম্মুখে সাদা কাগজ। একটু আগে আমি বই পড়ছিলাম। সোফোক্লিসের রাজা ঈডিপাস-এর কাহিনী। ঈডিপাসের মৃত্যুপথে সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির দৃশ্যটা অনুবাদ করবো ভাবছিলাম। একটা কবিতা লেখার কথাও মনে এসেছিলো। কিন্তু আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমার টেবিলে মেলে রাখা কাগজের ওপর অযথা ক'টা কাটাকুটি দাগ পডলো। প্রকাশ করতে পারলাম না সেই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের অন্ধকারকে। আকাশের গর্জন, অন্ধকার দিন, আকাশ থেকে উল্কা ছুটে আসা, বজ্রপাত—আর সেই না-অন্ধকার, না-আলোকিত বন্ধুর পথ ধরে নিয়তিলাঞ্ছিত অন্ধ একটি বৃদ্ধের মৃত্যু-স্থানের দিকে এগিয়ে যাওয়া, তারপর পেছনে স্নেহময়ী কন্যার অসহায় কান্না। আর তারও পেছনে দুই অভিশপ্ত পুত্রের বিবাদ।

আমি চেষ্টা করেও পারলাম না সেই দৃশ্যটা ভাষা দিয়ে ধরতে।

একটু পর আমার ঘুম আসছিল। হঠাৎ কি আশ্চর্য, মেঘ ডাকলো। জেগে উঠলাম আমি। ঈডিপাসেব কাহিনী পড়তে পডতে আমাব ভুল হচ্ছে না তো। স্বপ্ন দেখছি না-তো!

এবং ঠিক তখনই আমার ঘরের খোলা দবজার পাল্লা দুটো আছাড় খেলো সশব্দে। তারপর নামলো বৃষ্টি। টেবিলের ওপরকার একখানা কাগজ উড়ে গেলো। মনে পড়লো আনিসের চিঠি ওটা। আজকের

ডাকে চিঠিটা এসেছে। লাহোর থেকে লেখা। লিখেছে, আমি বাড়ীর কোন খবরাখবর পাই না। একটু খোঁজ নিয়ে জানাও তো কি অবস্থা ওখানকার। আমি ক'দিন পরই যাচ্ছি। সেই চিঠি উড়ে গেলো। আমি উঠলাম। দ্রুত বন্ধ করলাম জানালা গুলো। জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম ঝড়ের প্রথম ঝাপটা এসে পড়েছে ডান দিকের বকুল গাছের ওপর! বাঁ দিকের হাস্নু-হেনার ঝাড়টা প্রবল বেগে দুলতে লাগলো। আর সেই সঙ্গে শুনলাম একটা ক্রুদ্ধ গোঙানী। কোন ক্ষিপ্ত-দৈত্য যেন রাগে গোঁ গোঁ করে উঠছে। বিদ্যুৎ চমকে উঠছে একেক সময়, একেক সময় বাজ পড়ার শব্দ আসছে আর তার সঙ্গে মেঘের ক্রুদ্ধ গর্জন।

বন্ধ ঘরের ভেতর এখন হাওয়া নেই। কাঁচের ওপারে দেখলাম সমস্ত গাছপালা গুলোকে কোন অদৃশ্য শক্তি এসে প্রবল ঝাঁকি দিচ্ছে। আমি সেই উন্মত্ত ঝাঁকুনি দেখতে পাচ্ছি বিদ্যুতি আলোকে।

কিছুক্ষণ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে ঝড়ের এই ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ দেখলাম। তারপর আবার এসে বসলাম চেয়ারে।

কি বিশ্রী গরম গিয়েছে ক'টা দিন। তারপর আজ এই ঝড়, এই বৃষ্টি। একবার ইচ্ছে হলো বাইরে গিয়ে দাঁড়াই ঝড়ের মাঝখানে। বৃষ্টিতে ভিজি কিছুক্ষণ। একটু পর এই ছেলেমানুষী ইচ্ছের জন্যে নিজেরই হাসি পেলো।

তারপর এক সময় টিনে ছাওয়া বারান্দার ওপর থেকে অন্যতর শব্দ শুনতে পেলাম। এতক্ষণ ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছিলো, সেই শব্দে মনে হচ্ছিলো কোন নট তার সঙ্গিনী নটীদের নিয়ে জলদ তালে সমবেত নৃত্যে মেতে উঠেছে। সেই তরল শব্দের বিপুল ঝঙ্কারে ঘুমের আবেশ আছে যেন। সেই শব্দের মাঝখানে হঠাৎ অন্য শব্দ শুনতে পেলাম। পরিচিত অজস্র ধাতব শব্দ বেজে উঠলো চার-পাশে। বুঝলাম, শিলাবৃষ্টি হচ্ছে।

ঠিক সেই সময় একটা শিলা আমার কাঁচের জানালার ওপর এসে পড়লো। কাঁচ ভেঙ্গে ঝনঝন করে মেঝে ময় ছড়িয়ে পড়লো।

তারপর একের পর এক শিলার আঘাত আসতে লাগলো। জানালার আরো কয়েকটা চৌকো কাঁচ ভাঙ্গলো। আর সেই সঙ্গে হাওয়া এলো। বাইরে এখন প্রবল তাণ্ডব। ঘরময় হাওয়া। বৃষ্টির ছাঁট ঘরের ভেতরে ঢুকছে। ভিজিয়ে দিচ্ছে আমার বিছানার চাদর, টেবিলের ওপরকার কাগজপত্র।

এক সময় শুনলাম পাশের বকুল গাছটা শব্দ করে ভেঙ্গে পড়লো। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরটা অন্ধকার। ঘরের সব গুলো বাতি নিভে গেলো। বুঝলাম গাছ পড়ে লাইনের তার ছিঁড়লো। এ বাতি আর আজ রাতে জ্বলছে না।

ঘরটা অন্ধকার। অন্ধকারে ঝড়ো হাওয়া ঘরের ভেতরে ঢুকছে। আমি ইচ্ছে করলে মোম জ্বালাতে পারি। টেবিলে দেশলাই রয়েছে। ড্রয়ার হাতড়ালে কয়েক টুকরো মোমবাতি পাবো।

কিন্তু কি লাভ। আমি তো পড়াশুনা করতে যচ্ছি না আর। এখন বিছানায় শুয়ে পড়া। সেতো অন্ধকারেই পারা যায়।

হঠাৎ মনে হলো, কেউ যেন আমাকে ডাকছে। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে অসহিষ্ণু হাতে। একবার মনে হলো অনেকক্ষণ ধরেই শব্দটা শুনতে পাচ্ছি। হয়তো ওটা হাওয়ার ঝাপটা। কান পাতলাম, আর তক্ষুনি শুনলাম, ব্যাকুলকণ্ঠে কোন মেয়ে ডাকছে, দরজাটা খুলুন।

এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললাম। ঝড়ের ঝাপটার সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে ভেতরে এসে ঢুকলো। অন্ধকারেই বুঝলাম, অনেকক্ষণ ধরে ভিজছে, নিশ্চয়ই ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরেছে ওর। দরজা বন্ধ করে অন্ধকারেই ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কে আপনি ?

আমি মঞ্জু।

মঞ্জু ? ঠিক চিনতে পারলাম না যেন।

চৌধুরী বাড়ীর মঞ্জু।

বুঝলাম চৌধুরী বাড়ী, অর্থাৎ আনিসদের বাড়ী। মেয়েটি আনিসের কি রকম যেন বোন হয়।

হঠাৎ এত রাতে কোথায় গিয়েছিলে? জিজ্ঞাসা করতে হলো আমাকে।

বন্ধুর বাড়ী থেকে ফিরছিলাম, মাঝখানে এই দুর্যোগ।

বসো তুমি, একখানা কাপড় দি, গা মুছে কাপড় বদলাও।

বললাম বটে, কিন্তু কোন্ কাপড় দেবো তাই ভেবে পেলাম না। বাড়ীর ভেতরে এখন মা'কে ডাকলে সাড়া পাবো না। আমার ডাক কেউ শুনতে পাবে না।

ও নিজেই বললো, যাক আপনি ব্যস্ত হবেন না। কতক্ষণ আর ঝড় থাকবে। একটু থামলেই চলে যাবো।

অনেক চেস্টা করে মোম জ্বালালাম। দেয়ালের পাশে বই ঢেকে আড়াল করলাম মোমটা। আর সেই আলোয় দেখলাম, একটা সুন্দর মেয়ে ভিজে একাকার হয়ে আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে।

ও বোধ হয় ভয় পেয়েছিলো। কেঁদেছে হয়তো বা ভয়ে। মুখটা ভেজা, চোখ দুটো লাল। ভেজা কাপড়ের আড়াল থেকেও যৌবনের রক্তিম উল্লাস চোখে পড়ে। ও নিজের শরীরটা নিয়ে লজ্জিত হলো যেন। নিজেকে আড়াল করবার জন্যে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আমার সম্বন্ধে হয়তো কিছু সন্দেহ করে বসতে পারে।

কোথায় গিয়েছিলে, বললে না তো? আমি পরিবেশটাকে সহজ করবার জন্যে বললাম।

বললাম তো, বন্ধুর বাড়ী!

কেমন বন্ধু তোমার, এই ঝড়-বৃষ্টির মুখে এত রাতে ছেড়ে দিলো তোমাকে?

ওর কি দোষ, ভেবেছিলাম ঝড়ের আগেই বাড়ীতে পৌঁছতে পারবো।

দেখলে তো! আমি আরো সহজ হলাম, মেয়েরা কত কম জানে।

কি?

সব কিছু। কোন কিছু সম্বন্ধে ওদের ধারণা ঠিক হয় না।

ও এবার হাসলো। না হাসলো না, হাসতে চেষ্টা করলো যেন। বললো, ছেলেদের ধারণাই বুঝি ঠিক হয় সব সময়?

সব সময় হয় না। সময় সময় হয়, মেয়েদের কোন সময়েই হয় না।

হ্যাঁ, বলেছে আপনাকে হয় না। বাচ্চা মেয়ের মতো উত্তর দিলো ও। বুঝলাম এতক্ষণে কিছুটা সহজ আর আন্তরিক হয়ে উঠতে পারছে।

আনিস এসেছে? একটু পর জিজ্ঞেস করলাম আমি।

আমার কথায় চমকে উঠলো। একটু চুপ করে বললো, না, আসেনি, কেন?

ওর আসবার কথা আছে দু'এক দিনের মধ্যে।

হয়তো আসবে দু'এক দিনেই, মেয়েটা ধীরে ধীরে এ-কথার জবাব দিলো।

লক্ষ্য করে দেখলাম ওকে। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠতে চাইছে, সহজ হবার জন্যে। কিন্তু পারছে না। কোথায় যেন একটা আড়াল তুলেছে। আর সেই আড়ালে নিজেকে লুকোতে চাইছে।

বাইরের দিকে তাকালাম। শিলাবৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু বৃষ্টি পড়ছেই। ঘরের ভেতরে মোমের আলোর মৃদু আভা। মঞ্জুর বিষণ্ন মুখে সে আলোর আভা পড়েছে। মেয়েটার দু'চোখে অনেক দিনের ক্লান্তি। তবু সেই ক্লান্তির মধ্যেই যেন কোথায় একটা তীক্ষ্ণতা রয়েছে যা হঠাৎ এক সময় দীপ্ত হয়ে উঠতে পারে।

বৃষ্টি থামবার লক্ষণ দেখছি না। মেয়েটা ঘরের এক কোণে বসে। উঠবার কোন লক্ষণ দেখছি না। এদিকে আমার ঘুম পাচ্ছে। বললাম, চলো তোমাকে রেখে আসি বাসায়।

চকিতে মঞ্জু আমার চোখের দিকে তাকালো। বললো, দেখি আর একটু অপেক্ষা করে যদি বৃষ্টিটা ধরে।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। আবার আমাকে বসতে হলো নিজের জায়গায়। একটু পর ও বললো, আপনার খুব অসুবিধা হচ্ছে, তাই না? হয়তো ঘুম পাচ্ছে আপনার।

না, না। সে কথা নয়, আমি বিব্রত হলাম একটু। বললাম, আমি তোমার কথা ভাবছি। তোমাদের বাড়ীর সবাই হয়তো ভাবছেন।

না, কেউ ভাবছেন না।

না ভাবুন, তবু তোমার যাওয়া দরকার।

কেন? ধরুন আমি আজ রাতটা এখানেই থেকে খুব ভোরে উঠে চলে গেলাম। সেটা কেমন হয়? আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো মঞ্জু।

আমি অবাক। একি ভয়ঙ্কর কথা বললো মেয়েটা। অমন শান্ত মেয়ে এমন কথা বলবে এ-যে স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

না, আপনাকে বিব্রত করবো না। ও হেসে ফেললো, আমি আপনাকে খুব সাহসী ভাবতাম। আপনার গল্পের মধ্যে যে সব সাহস ও সততার কথা লেখা থাকে সেই লেখা পড়েই আপনার সম্বন্ধে অমন ধারণা হয়েছিলো আমার। এখন দেখছি লেখক আর আসল মানুষের মধ্যে পার্থক্য অনেক।

আমি তখনও ভাবছি। এ মেয়ে কেমন করে এত মুখরা হলো। অমন শান্ত যে, অমন স্নিগ্ধ যার ব্যবহার, অমন সুন্দর যে, তার মুখ দিয়েএ-সব কথা কেমন করে বেরুচ্ছে!

ও তখন বলছে, ভাববেন না, বৃষ্টি থেমে গেলেই আমি চলে যাবো। ঘুম পেয়ে থাকলে ঘুমোন আপনি।

কিন্তু যদি বৃষ্টি না থামে? আর অত রাতে কেমন করে একা একা যাবে? চলো তোমাকে পৌঁছে দি।

না, না। আমি একাই যেতে পারবো। এই ঝড়-বৃষ্টির দিনে আপনি আর কেন কষ্ট করবেন মিছিমিছি। বৃষ্টিটা ধরে এলেই চলে যাবো। আপনি ঘুমোন।

ও আমার কাছাকাছি উঠে এলো। বললো, আমি আপনাকে ভাই বলে ডাকি নি ?

হ্যাঁ, স্বীকার করলাম।

তবে সঙ্কোচ করছেন কেন ?

না বাপু তুমি বাড়ী যাও। সঙ্কোচ আমার জন্যে নয়, তোমার জন্যে।

বাঃ, একদিনের পাতানো বোনের জন্যে ভাবী দরদ দেখছি। হেসে ফেললো মঞ্জু। কিন্তু এই কি হাসি নাকি? দেখলাম, এ যে কান্নারও বেশী।

একটু পরে মঞ্জু আবার বললো, আমি বাসায় ফিরছি না আর চন্দন ভাই।

কোথায় যাবে ?

দেখি তো। পৃথিবীটা মস্ত বড়।

ওকে এই মুহূর্তে অন্যমনস্ক মনে হলো।

কী বাজে কথা বলছো। কী হয়েছে, ঝগড়া হয়েছে কারু সঙ্গে ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

না, ঝগড়া নয়! তা' যদি হতো তা'হলে তো বেচে যেতাম ? দীর্ঘশ্বাস গোপন করলো মেয়েটা। একটু থেমে আবার বললো, এ জায়গাটা আমার ভালো লাগছে না, এমনকি আমাদের নিজের বাড়ী, অথবা বাড়ীর চারপাশের লোকদেরও ভালো লাগে না। একেক সময় মনে হয় অন্য কোথাও যেতে পারলে বোধ হয় আমার ভালো লাগবে।

ওর কথায় কী যেন ছিলো, আমি প্রশ্ন করতে চাইলাম না। কেন না আমার কাহিনী-পিপাসু মন তখন সজাগ হয়ে উঠেছে।

জীবনের কোন নতুন দিক হয়তো আমার চোখের সামনে ফুটে

উঠবে। আমি লক্ষ্য করলাম ওকে। ও তখন চেয়ারের পিঠে হাত রেখে দাঁড়িয়েছে।

তারপর হঠাৎ বললো, কি সব আজে বাজে কথা বলছি, আপনার তো শরীর খারাপ শুনেছি, আপনি ঘুমোন। তারপর হেসে ফেললো, না ভয় নেই, আমি সত্যি সত্যি পালাচ্ছি না। বৃষ্টিটা থামলেই চলে যাবো।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। ও এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললো, শোন, শুয়ে পড়ুন। যেন নিজের ছোট ভাইকে ধমকে শুতে বলছে।

আমি হাসলাম। শুয়ে চাদর টেনে নিলাম গায়ে। মঞ্জু আবার চেয়ারে গিয়ে চুপ করে বসলো।

খানিকপর মোমটা নিভে গেলো।

আমি উঠতে চাইলাম, একটা মোম জ্বালিয়ে রাখি।

আমাকে উঠতে দেখে ও বললো, ওকি আবার উঠছেন কেন?

বাতিটা জ্বালাই।

কী দরকার! এখন ঘুমোবেন তো আপনি।

তোমার কোন অসুবিধা......

না, কিচ্ছু অসুবিধা হবে না আমার, আপনি ঘুমোন।

কিন্তু তাই বলে কি অত সহজেই ঘুম আসে আর। বিশেষতঃ এমনি অদ্ভুত একটা পরিবেশে। একটি স্বল্প পরিচিতা মেয়ে রয়েছে ঘরে। কেমন করে ঘুম আসে! এপাশ ওপাশ ফিরে একটু পর বললাম, বরং তোমার কথা বলো শুনি।

ও তাড়া দিলো, উঁহু। আপনি ঘুমোচ্ছেন, আপনার সঙ্গে কথা বলছি না আমি।

তারপর ওর সম্বন্ধে ভাবলাম। একবার ভাবলাম ক'টা বাজে, কখন বৃষ্টি থামবে। একবার অফিসের কথা মনে পড়লো। আগামীকাল

আমি কি কি কাজ করবো তার কথা। তারপর মশারীর চাঁদোয়ার চৌকো রেখাগুলো গুণতে চেষ্টা করলাম। তারপর, তারপর আর জানি না।

হঠাৎ দড়াম করে দরজায় ধাক্কা লাগার শব্দ শুনলাম। সেই শব্দে জেগে উঠলাম। দেখলাম রাত্তি ভোর হয়ে এসেছে। এবং আবার ঝড় এসেছে। সেই মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের চাবুক। বৃষ্টির ঝমঝম গান।

আমি উঠে দরজা বন্ধ করলাম। আর দরজা বন্ধ করেই মনে হলো মঞ্জুর কথা। [illegible] বারান্দায় এসে ওর নাম ধরে ডাকলাম। কোন সাড়া এলো না। [illegible] বোধ হয় ঘরের মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। [illegible] হাতের [illegible] মেঝের [illegible] দেখলাম। না, মঞ্জু নেই। হয়তো বৃষ্টি একটু থেমেছিলো তাই ও একাকী চলে গিয়েছে। এতোক্ষণ হয়তো বাসায় পৌঁছে গেছে [illegible]।

বাইরে তখন ঝড়ের মাতামাতি। সন্ধ্যের পর ঝড় হলো। এখন আবার এই শেষ রাতে।

তবু আজকের রাতটা [illegible]। [illegible] ঝড় এলো। আবার ঘরের বাতি নিভলো, জানালার কাচ ভাঙলো, আর সেই সঙ্গে এলো একটি মেয়ে।

সেই মেয়ে [illegible] এক সময় চলে গেলো। তারপর আবার এই ঝড়। এক ঝড়ের [illegible] এসে আশ্রয় নিয়েছিলো, আর এক ঝড়ের [illegible] চলে গেলো। এমন ঘটনা কি হয়?

ঝড়ের [illegible] যে কোন লোকই তো আশ্রয় নিতে পারে, এবং কাউকে কিছু না বলে [illegible] আবার চলে যেতে পারে। ঘটনাটা তুচ্ছ অ[illegible]। কিন্তু তবু যেন রহস্যের মতো মনে হয়। ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে ছিলো, সুন্দর বৃষ্টি সিক্ত দেহ নিয়ে। তারপর এক

সময় কী সহজ ভাবে কথা বললো। ওর কথায় কী যেন একটা বেদনা ছিলো, চলে যাওয়ার পর এখন ওর কথা আমার বার বার মনে পড়লো।

ঘরে মোমের আলো কাঁপছে। সেই আলোয় টেবিলের ওপর কালোরঙের একটা মোটা বাঁধানো খাতা চোখে পড়লো। এগিয়ে গেলাম। এ খাতা আমার নয়। খুললাম, আলোর কাছে এসে। আর দেখলাম মেয়েলি হাতের গোলগোল গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, ডায়েরীর মতো। হ্যাঁ, একখানা ডায়েরী।

মঞ্জুর লেখা নিশ্চয়ই। ও ফেলে গিয়েছে। এ ঘর থেকে বেরুবার সময় হয়তো খেয়াল ছিলো না। ওর নাম কি মনিরা? কে জানে? হয়তো ওর। হয়তো ওর নয়, অন্য কারুর, ওর সাথে ছিলো। সে যাক, সকাল বেলাই এটা ফেরত দিয়ে আসতে হবে।

সকাল হ'লে বেরুলাম। ঝড় বৃষ্টির পর কি সুন্দর ঝক্‌ঝকে সকাল।

ওদের বাড়ীর কোন ক্ষতি হয়নি। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, কেউ বাড়ী আছেন? দু'তিনবার ডাকাডাকির পর একটি ছোট ছেলে বেরুলো। তার পেছনে এক মহিলা।

জিজ্ঞেস করলাম, আনিস এসেছে?

না, আসেনি, জবাব এলো মহিলার কাছ থেকে।

মঞ্জুকে ডেকে দিন তো।

মঞ্জু বাড়িতে নেই। ভদ্রমহিলার কণ্ঠ স্বর অস্বাভাবিক মনে হলো।

নেই? আমি আবার প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ, কাল থেকে ওকে পাওয়া যাচ্ছে না।

সেকি! খোঁজ নিয়েছেন?

হ্যাঁ, বেনুকে থানায় পাঠিয়েছি। আকরাম সাহেব ওর চাচাদের ওখানে খোঁজ নিতে গিয়েছেন। মহিলার গলা বেশ ভারি বোধ হয় কেঁদেছেন সারা রাত।

জানানো উচিৎ ছিলো যে আমার ঘরে কাল রাতে ঝড়ের সময় মঞ্জু আশ্রয় নিয়েছিলো। অথচ জানালাম না! কতকটা পুলিশের ঝামেলা এড়াবার জন্যে, আর কতকটা, মঞ্জুর কথা স্মরণ করে। কেননা সেই সময় মনে হচ্ছিলো, হয়তো মঞ্জু এ-বাড়ী থেকে এমনি এমনি চলে যায় নি। নিশ্চয়ই কোন কারণ ঘটেছিলো।

কিন্তু এ চিন্তাও ছিলো আমার অস্ফুট অনেকটা স্বাভিবিক যান্ত্রিক ক্রিয়ার মতো। আসলে আমি বিমূঢ় হয়ে গিয়ে ছিলাম তখন। একটা মেয়ে সত্যি সত্যি বাড়ী ছেড়ে গেলো, আর সেই মেয়ে দুর্যোগের রাতে আশ্রয় নিয়ে ছিলো আমারই ঘরে। এবং সে জানিয়ে ছিলো যে সে চলে যাবে।

বাসায় ফিরে এসে আমার ক্ষোভ হলো। কেন ওকে জোর করে ওদের বাড়ীতে রেখে যাই নি। আর যদি বা আমার এখানে থাকলো, কেন বাড়ীর ভেতরে থাবার ব্যবস্থা করে দিলাম না।

যদি তাও না পারতাম তবু কেন ওর সব কথা শুনলাম না।

আমার মনে পড়লো গত রাতের কথা। একটি মেয়ে কি সুন্দর আর শান্ত। হঠাৎ সে অস্বাভাবিক মুখরা হয়ে উঠলো। তার পরই শোনা গেল ওর কণ্ঠে বিষণ্ণ স্বর। কী যেন গভীর দুঃখ ওর জীবনে, যা ওর কথার মধ্য দিয়ে আভাসে ফুটে উঠেছিলো। আমি বুঝতে পারি নি বাসায় ফিরে এসে সেই ডায়েরীটা নেড়েচেড়ে দেখলাম। তারিখ লেখা রয়েছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ওর দিনলিপি। পর পর তারিখে লেখেনি। মাঝখানে এক সপ্তাহ কি দু'তিন দিন ফাকা, কোথাও বা মাস খানেক। তারপর আবার পর পর। কোন কোন অংশ সুদীর্ঘ। তখন নেড়েচেড়েই শুধু দেখলাম। পড়তে পারলাম না। কারণ তখন পর্য্যন্ত উদ্বেগে কষ্ট পাচ্ছি, কোথায় গেলো মঞ্জু!

দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। ওরা খবরটা শুনে হেসে উঠলো। বললো, বোধ হয় সুইসাইড-ফাইড করে বসেছে, খুঁজলেই পাওয়া যাবে।

কেন, সুইসাইড করবে কেন ?

বাঃ, কিছুই জানেন না দেখছি, মেয়েটাতো খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। গরীবের মেয়ে, বাপু তোর কি সামর্থ্যে কুলায় আহমদ সাহেবের মেয়ের সঙ্গে ঘোরাফেরা করায় ! নিশ্চয়ই কিছু করতো। তাজিনার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা তো কম ছিল না তার। হয়তো বাচ্চা-টাচ্চা এসেছিলো পেটে।

আমি স্তম্ভিত। অমন সুন্দর, অমন শান্ত আর অমন ব্যক্তিত্বের মেয়ে যে এতোখানি খারাপ ছিলো ভাবতেও কষ্ট লাগে।

একজন তো বললো, ভাবীসাহেব, ছেড়ে দিন ওসব ব্যাপার। যতো ভালোই বলুন, ঐ শুধু বাইরেই। কোন মেয়েটা আর সতী আজকাল ? ওরও স্বভাব খারাপ হয়েছিলো কোনো না থেকে। যেমন মা, তেমন তো মেয়ে হবে। মেয়েটার মাস্টার রেখেছিলেন তো ? চৌধুরী সাহেব থাকতে কড়াকড়ির ভেতরে কিছু। যেতে পারতো না ইচ্ছেমত। এবার ইচ্ছেমত ফূর্তি করবার জন্যে ভেগেছে কারুর সঙ্গে। অপেক্ষা করে থাকুন। খোজ পেয়ে যাবেন। হয় ফিরে আসবে, নইলে শুনবেন কোন শহরে নিজে ব্যবসা খুলেছে।

ওদের কথার সময় আমি কিছুই বলতে পারলাম না। শুধু শুনে গেলাম। কেন না ওদের কথার তো কোন মানে হয় না। আর করেই বা লাভটা কোথায় !

তবু আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। কোন মতেই ভুলতে পারছিলাম না, আতঙ্কিত বিষণ্ণ তার সুন্দর একখানি মুখ। যে অমন সুন্দর হলো, সহজ হলো। একেবারে নিজের বোনের মতো আমাকে শাসন করলে একটুখানি, যার বুকে কোথাও গভীর কষ্ট ছিলো—সেই মেয়ের সম্বন্ধে ওদের একটা কথাও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করলো না।

কিন্তু যদি পুরোপুরি অবিশ্বাসও করতে পারতাম, তাহলে যেন স্বস্তি পেতাম। কিন্তু তাও যে পারি না। কেবলি মনে হয়, হতেও তো পারে? মানুষ কোন্ অবস্থায় কি করে, তাতো বাইরে দেখে বোঝা যায় না।

এদিকে একে একে দিন কাটলো। আমি ডায়েরীটা পড়লাম। একদিনে পড়তে পারিনি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যেকটা ঘটনা, আর সেই ঘটনাগুলো কিভাবে মঞ্জুকে ভাবিয়েছে সব পড়তে হলো আমাকে। যত পড়লাম, ততোই দুঃখ হলো। আনিসকে চিঠি লিখলাম। মঞ্জুকে খুঁজলাম। জানি না ওর সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে কি না।

আনিসকে ফেরত দিইনি ডায়েরীটা। ওকে এই ডায়েরী সম্বন্ধে জানাইও নি। কেন না জানতাম, এই ডায়েরীর কথা জানতে পারলে আনিস ভয়ানক কষ্ট পাবে। হয়তো শেষ পর্যন্ত নিজেকেও অপরাধী ভাবতে পারে। তার চেয়ে ওটা আমার নিজেরই কাছে থাকা ভালো।

আমি ভুলতে পারি না সে মেয়েটিকে। যে এক ঝড়ের রাতে এসেছিলো ঝড়ের মুখে পাখীর মতো। একটুখানি আশ্রয় নিয়েছিলো। তারপর আবার আরেক ঝড়ের মুখে চলে গেলো। যাওয়ার সময় ফেলে গেলো দু' এক টুকরো কুটো। ওর জীবন দিয়ে সঞ্চিত কুটোগুলোকে সাজাতে বসেছি। দোষ করছি কি না জানি না। করলে, মঞ্জু আমাকে তুমি ক্ষমা ক'রো।

আবার ঝড় আসবে। শিলাবৃষ্টি হবে, আমার ঘরের বাতি নিভে যাবে, একাকী অন্ধকারে থাকবো। কিন্তু আর দরজায় ব্যাকুল কণ্ঠের ডাক শুনবো না। সেই একটি মেয়ে এ ঘরে আশ্রয় নিতে আসবে না। আর এসেই বা লাভ কি? আমরা কেউ তো আশ্রয় দিতে পারি না।

কেন যে লিখছি আমার কথা, নিজেই জানি না। শুধু জানি যে লিখতে ইচ্ছে করছে আমার। সব কথা তো কারুকে খুলে বলতে পারি না। এ বাড়ীতে আসার পর চার বছর হয়ে গেলো। আমার গেঁয়ো পোষাক বদলালো, লোকের সঙ্গে সহজ ভাবে কথা বলতে শিখলাম। ক'দিন স্কুলে গিয়ে স্কুল ছেড়ে দিলাম, (আমার বয়সের মেয়ে কেউ স্কুলে পড়ে নাকি, ছিঃ।) কিন্তু কোনদিন মনে হয়নি আমার লিখে রাখবার মতো কোন কথা আছে আর সেগুলো একবার হারিয়ে গেলে আমার ভয়ানক কষ্ট হবে। বাবার কাছ থেকে পয়সা চেয়ে বেণুদাকে দিয়ে খাতাটা আনিয়েছি। আর রাতে অনেক রাতে লিখছি। দিনে পারবো না, রোজ রাত্রে এ সময়ে লিখতে হবে আমাকে।

আজ আনিস ভাই এলো ঢাকা থেকে। দু'বছর ছিলো না ও বাড়ীতে। সেই যেবার আমি এখানে এলাম, তার দিন কয়েক পরই চলে গিয়েছিলো পড়তে। যাবার সময় বলেছিলো, তুই চলে যাসনা, থাকিস্ এবাড়ীতে, পড়াশোনা করিস মনোযোগ দিয়ে।

আনিস ভাইয়ের সে কথা আজই আবার নতুন করে মনে পড়লো। আনিস ভাই যেন কেমন ধরনের লোক। হ্যাঁ, কেমন যেন। যে ক'টা দিন ও ছুটিতে এসে বাড়ীতে থাকতো তখন দেখতাম সারাটা দিন যেন কোথায় কোথায় কাটাতো। মাথায় তেল নেই, জামাকাপড় নোংরা, বিশ্রী গন্ধ করতো। কতদিন বলেছি ঘরটা খুলে রেখে যাবেন, জিনিষ পত্র গুছিয়ে রাখবো। আনিস ভাই ধমকে উঠেছে। বলেছে, না, আমার ঘরে ঢুকতে হবে না কারুকে। সকলে বলে আনিস ভাই ভালো ছেলে,

কিন্তু ওর কোথায় যে ভালো আমি কিচ্ছু বুঝতাম না। শুধু মনে হয়েছে, আনিস ভাই অমন কেন ?

না, ও ঢাকা থেকে গত দু'বছরে একবারও বাড়ীতে আসেনি। বাবা চিঠি লিখেছেন, ছোট আপা কতো অনুরোধ করেছে—কিন্তু বাড়ীর কথা যেন ও ভুলে ছিলো। আমার মনে হয়েছে ও অমন ধরনেরই লোক। যখন যেখানে থাকে সেখানেই ডুবে থাকতে পারে। পেছনে কি ফেলে এলো না এলো সেদিকে ওর লক্ষ্য থাকে না।

আজ এলো। দরজা খুলে দিলাম আমিই। সেই পুরানো চেহারা। কতোদিন যে চুল কাটে নি, গায়ে বিচ্ছিরি ঘামের গন্ধ। আমাকে দেখেই অপ্রস্তুত হয়ে সরে দাঁড়ালো। মুখ দিয়ে বোধহয় একটা বিস্ময়ের প্রশ্নও উঠে এসেছিলো, আপনি ?

হেসেছি তখন, হ্যাঁ আমি মঞ্জু।

ও মঞ্জু! আশ্বস্ত হলো যেন আনিস ভাই। তারপর বললো, তোকে চিন্‌তেই পারিনি।

না, আনিস ভাই চিন্‌তে পারেনি আমাকে। হয়তো দু'বছর আগে আমি সবে শাড়ি পরতে শিখেছিলাম। আজ দু'বছর ধরে আমি শাড়ি ছাড়া আর কিছু পরি না। লম্বাও হয়েছি অনেক হয়তো। তাই বলে চিনতে পারবে না একেবারে' আর আজ এখন চিন্‌তে পেরেও যেন কিছুটা সংকোচ রয়েছে ওর দেখলাম। দেখলাম আর খারাপ লাগলো আমার। মানুষ এতো সহজেই ভুলে যেতে পারে!

খানিক পর আমি ভেবেছি। সত্যি তো, আমাকে মনেই বা রাখবে কেন ? আমি তো এ-বাড়ীর কেউ নই। না, কেউ নই। মার তখন কষ্ট হচ্ছিলো, মার পেটে মম্, কাজকর্মে ভারি অসুবিধা, ছোট আপার আই-এ পরীক্ষা,—ঠিক এমন সময় এলাম আমি। কাজকর্মে মাকে সাহায্য করতে। সেই যে এলাম আর গেলাম না। আমার এখন ভালো লাগে এ বাড়ীতে থাকতে। মম্ পুতুল আমার জন্যে কাঁদে। তাছাড়া

মার কাজে কত সাহায্য হয়। ছোট আপা কলেজের পড়াশোনা করে কাজকর্ম দেখাশোনা করতে পারে না। আমাকেই দেখতে হয় সব। বাবার গোছলের পানি তুলে রাখা, পুতুল মমকে খাওয়ানো, গোসল করানো, ওদের জামা কাপড় পরিয়ে দেওয়া [illegible] সব মা পারেন। কেন সে পারে না আমি বুঝতে পারি না। যখন মম ছোট্ট ছিলো তখন পারতো না, কিন্তু এখন মম বড় হয়ে গেলেও আর ওসব কাজ নিজের হাতে নিলো না। কেবল বসে উনুনের পাশে বসে রান্নাটুকু করে শুধু। আমি এমন ভাবে রয়েছি এ-বাড়ীতে শুধু একথা ভাবতে পারি না যে আমার কথা কেউ ভাবে না ওর। না, কেউ না। বাবা ভাবেন না। কেন না জানেন তো, আমি এখান থেকে একদিন না একদিন চলে যাবো। মাও জানে আমাকে চলে যেতে হবে। বাকল, ছোট আপা, এরাও শুধু কথাই বলে। তাও দরকার পড়লে।

না, এরা আমার কথা ভাবে না। তবু মনে মনে কেউ যেন বলেছিলো, আনিস ভাই হয়তো আমার কথা ভাববে। কিন্তু আজ আনিস ভাই এলো, অথচ আমার সঙ্গে কথাই বললো না। জিজ্ঞেস করলো না, আমি পড়াশোনা করছি কিনা, জিজ্ঞেস করলো না, কেমন আছি। সেই চার বছর আগে, [illegible] না কিছু বলতো। হয়তো বলতো, [illegible] কিম্বা বলতো, মেয়েরা সবাই পাগল।

আজ কিছু বললো না। ব্যাগটা বারান্দায় ছুঁড়ে ফেলে মম্ আর পুতুলকে কাঁধে তুলে চলে গেলো মা আর ছোট আপার কাছে। আমি দেখলাম থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কে জানে কেন আমার তখন কান্না পাচ্ছিলো ভীষণ।

আজ সুন্দর একটা বই পড়লাম। ইংরাজী বই। ভাল বুঝতে পারি না, তবু পড়লাম। কতক বুঝলাম, কতক বুঝলাম না। কিন্তু যে টুকু বুঝলাম ভারী সুন্দর লাগলো। আরেকবার পড়তে ইচ্ছে করছি। ঠিক এমনি সময় ছোট খালা বেড়াতে এলো। বইটা

লুকোতে হলো। বাইরের কেউ জানে না আমি ইংরেজী পড়তে পারি। যদি ছোট খালা জানতে পারে তাহলে হেনস্থার একশেষ করবে। টিটকারিতে পাড়া মাত করে দেবে।

ওরা সবাই বলে, ইংরেজী নাকি খুব কঠিন। কিন্তু কই। খুব তো কঠিন মনে হয় নি আমার কাছে। এমন কঠিন তো বাংলাও। বাংলা পড়ার সময় ছেলেবেলায় বন্ধুরা বলতো, কি কঠিন। কিন্তু আমার কাছে তখন বাংলাও সোজা লাগতো।

ইংরেজী পড়তে বলেছিলো আনিস ভাই। সেও চার বছর আগে যখন ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। সেই থেকে রোজ একটু করে পড়তাম। ছোট আপার কাছে রাহুল যখন পড়তো, শুনতাম। আর নিজে নিজে পড়তাম একাকী।

যাক সে কথা। যে জন্য আজ ডায়েরী লিখতে বসা। ছোট খালা আমাকে কী চোখে যে দেখেন। মাকে বললে, তুই মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করছিস না কেন?

মা কিছু বললো না। আমার ভাবি রাগ হ'লো। কেন রে বাপু, তোর অতো মাথাব্যথা কিসের।

কানাঘুষোয় শোনা পুরনো একটা কথা তুললো। দাদু নাকি আমার বিয়ে ঠিক করছেন। ছেলে কোথায় কোন অফিসের কেরানী, বাড়ীর অবস্থা ভালো, দেখতে শুনতে চমৎকার—এই সব।

মনে মনে আমি খোদাকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। খোদা যা করেন ভালোর জন্যেই করেন। এখানে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, আমি এদিক দিয়ে অন্ততঃ নিশ্চিন্ত আছি। আমি যদি দাদুর বাড়িতে থাকতাম তা'হলে। ও, সে কথা ভাবতেও আমার গায়ে জ্বর আসে। এতোদিন হয়তো ঘরে বন্ধ করে রাখতো, কাপড় আর জামার পুটুলি হ'য়ে চলাফেরা করতাম, হয়তো একের পর এক বরপক্ষ থেকে দেখতে আসতো, জিজ্ঞেস করতো নাম কি, হাঁটিয়ে পরখ করতো খোঁড়া

কিনা, চুল মাপতো কেউ, মাগো, কি বিচ্ছিরি কাণ্ড! খোদা তুমি রহমানুর রহিম। আমাকে তুমি বাঁচিয়েছো।

ছোট খালাকে চটিয়ে দিতে ইচ্ছে করলো। জানি তো ছোট খালার দুর্বলতা। ওঁর বড় মেয়ে সিনেমায় নামবে এই ভরসায় বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলো---সিনেমা হলের এক দারোয়ানের সঙ্গে। সেই কথা বললে ক্ষেপে যাব। যা তা বলতে আরম্ভ করে।

বললাম, খালা, মীনা কি গান শেখা ছেড়ে দিয়েছে?

তাতে তোর কি দরকার! ছোট খালা বিরক্ত হলো।

না। এমনি বলছিলাম। ওর মতো ভালো গান গাইতে পারলে এখন সিনেমায় নাম করা যায়।

এই মঞ্জু! মা শাসন করেছে আমাকে। আমি সরে গিয়েছি। আর ছোট খালা বকতে শুরু করেছে অনর্গল। চলেই যেতাম। কিন্তু একটা কথা কানে গেলো আমার। বারান্দায় দাঁড়ালাম, আর শুনতে হলো আমাকে।

নিজের বাপের মাথা তো খেয়েছিস, পরের বাড়ীতে এসে তোর আবার এতো তেজ হলো কোত্থেকে! দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে তো দাঁড়াবার জায়গা পাবি না। তুই কেন আমার মেয়ের চরিত্র দেখতে আসিস?

মা কিছু বললো না।

সেইখানে দাঁড়িয়ে ক্ষোভে দুঃখে মনে মনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম একেবারে। বাবা কেমন দেখিনি। কিন্তু শুনেছি বাবা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। মার দ্বিতীয় বার বিয়ে হলো, তখন ভালো বুঝতাম না। দেখলাম মা আমাকে ছেড়ে চলে গেলো। বাবার কথা কোনদিন ভাবিনি। এ বাড়ীতে এসে পুতুলের বাবাকে বাবা বলে ডাকতে হলো। এই বাবাকে দেখলাম। কিন্তু তবু আমার বাবার কথা উঠলেই কান্না পায়। আমি নিজেকে কোন মতেই সামলাতে পারি না। আমি বাবার মাথা খেয়েছি একথা কেন বলে ওরা?

মা কাছে থেকেও কোন কথা বললো না? মা এমন চুপ কেমন করে থাকতে পারলো। মা'কেও আমি হারিয়েছি।

বারবার আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি, আমাব মা কেন অন্যের মা হয়ে গেলো।

আমি নিজেব ঘবে এসে মুখ গুঁজে পড়েছিলাম বিছানায়। ছোট খালা চলে যাওয়াব অনেক পর পর্যন্ত। ছোট খালা চলে গেলে, আমি বাইরে এলাম। তখনও বুকের ভেতরে একটা কান্না ফুলে ফুলে উঠছিলো। মা আমাকে দেখে বললো, যা ঘর ঝাট দিয়ে বিছানা পাত গে যা। শুধু এই ক'টা কাজের কথা। আব কিছু না। আমার আরো কাঁদতে ইচ্ছে করছিলো। বিছানা পাততে গিয়ে আবার কান্না ছেয়ে এলো দু'চোখে। যদি তখন চক্‌বে কেঁদে উঠতে পারতাম।

কেন মা চলে এলো দাদুব বাড়ী থেকে। যদি'বা ওদের খারাপ ব্যবহারে চলে এলো, কেন নানার কাছে থাকলো না। কেন মা আবার বিয়েতে রাজী হলো। যদি না হতো, তাহলে যে মায়ের ওপব আমাব অধিকাব থাকতো। মা'ব বুকে মাথা রেখে আমি প্রাণ ভরে কেঁদে শান্ত হতে পাবতাম।

মা এমন কবলো কেন? কোন অভাব ছিলো মাব সেখানে? নানা সব সংসাবটাই তো মা'ব হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ঘব সংসারেরই যদি সাধ ছিলো মা'ব নানার কাছে থাকলেও তো পাবতো।

এমনি ভাবনার সময় মম এসে আমার কাঁধে চেপে বসলো। ওকে সরিয়ে দিতেই ও থমকে দাঁড়ালো। দেখলো আমাকে চুপ করে, তাবপর ধীরে ধীরে দোরের দিকে পা ফেলে ফেলে এগোতে লাগলো। হয়তো ভয়ে। ওর শুকনো মুখ দেখে ওকে কাছে টেনে বুকে জড়িয়ে ধবলাম। আমার কান্না ফেটে পড়লো বুকের ভেতরে। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে শান্তি পেলাম যেন।

মম্ মা'র কাছে চলে যাওয়ার পব, আমার কাজ শেষ হলো।

এমন সময় আনিস ভাই এলো। এসেই জিজ্ঞেস করলো, তোর মা কোথায়?

রান্না ঘরে, জবাব দিলাম।

চলে যাচ্ছিলো ও। দোরের কাছে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। তার পরই আমার পেছনে এসে দাঁড়ালো। বললো, তুই কাঁদছিস?

অনেকক্ষণ তারপর। কথা নেই। দু'জনে স্থির দাঁড়িয়ে। সময় আমার কাঁধে আনিস ভাইর হাত পড়লো আস্তে করে। আমার কাঁধে হাত রেখে আস্তে করে বললো, খুব কষ্ট হয় তোর এখানে না?

না, না কষ্ট কেন হবে, আমি ওর কথায় বাধা দিয়ে বলেছি।

হয়, আমি বুঝি। তারপর একটু থেমে বললো, তোর সব কথা বলবি আমাকে। একটু পড়াশোনা কর। কাঁদিস না, কথা দে আর কাঁদবি না।

ভারি আশ্চর্য তো। আমি হেসে উঠতে চেষ্টা করেছি, একদিন হয়তো এসে বলবে তুমি, হাসাও বারণ, হাসতে পারবি না।

আনিস ভাই আমার হাসি দেখে কেমন যেন নিশ্চিন্ত হয়েছে মনে হলো। আমার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নেবার আগে হাতে একটু মৃদু চাপ অনুভব করলাম। বললো, এই আমার ঘরটা একটু গুছিয়ে দিবি।

ওর ঘর গোছানোর কাজ পেয়ে আমার ভালো লাগলো। কোনদিন কাউকে আনিস ভাই ওর ঘরে ঢুকতে দেয় না। কেবল ভয়, কোন দরকারি কাগজপত্র হারিয়ে যাবে। আমাকেই বললো প্রথম। আমার ভালো লাগলো। ওর বিছানা ঝেড়ে, টেবিল গুছিয়ে, কলমে কালি ভরে, লেখার প্যাড সাজিয়ে তবে এলাম। আমার সারা মন হঠাৎ কেমন স্বচ্ছ সুন্দর হয়ে গেলো। ভারি ভালো লাগলো। আর সেই ভালোলাগা এখন পর্যন্ত আমার মনময় গানের সুরের মতো ছড়িয়ে রয়েছে।

আনিস ভাইয়ের ঘরে আজ বিকেলে একটা কাণ্ড ঘটে গেলো। ঠিক বুঝলাম না কেন এমন হলো। এখন কেবল লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে আমার।

আনিস ভাইয়ের হাত থেকে বইটা আনতে গিয়ে ওর হাত আমার হাত ধরলো। ওর হাত কী অদ্ভুত ঠাণ্ডা আর নরম। সেই [illegible] আমার হঠাৎ ইচ্ছে করছিলো, ওর হাত নেড়েচেড়ে দেখি ভালো করে। ওর হাত ধরতেই আনিস ভাই আমার দিকে তাকালো। এ যেন অন্য লোক। হ্যাঁ অন্য কেউ। যাকে আমি চিনি না, যাকে আমি কোনদিন দেখিনি। ওর চোখের ভেতরে কোথায় যেন একটা থমথমে কান্না। কেন যে আনিস ভাইয়েরও মনে তাহলে কান্না? [illegible] তাকিয়ে ছিলাম। কতক্ষণ যে [illegible] জানি না। [illegible] আনিস ভাই বললো, তুমি আমার কথা ভাবো, তাই না?

আনিস ভাই বুঝে ফেলেন, [illegible]। নইলে ও কেন আমাকে তুমি বললো। আমাকে এক মুহূর্ত [illegible] জবাবের জন্যে ভাবতে হলো। তখনও ওর হাত ধরে রেখেছি। তারপর মুখ নীচু করে ফেললাম। বললাম, সেও মুখ দিয়ে কথা ফুটে বেরুলো কি বেরুলো না, হ্যাঁ, তোমার কথা ভাবি। তারপর আর দাঁড়ালাম না। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। মনের ভেতরে কে যেন প্রচণ্ড ধমকে উঠলো তখন।

আমারই দোষ, যতো দোষ আমারই। আমারই মনের ভেতরে যেন কোথায় একটা কুটিল আবর্ত রয়েছে। সহজ কথাকেই আমি জটিল করে ফেলি। আনিস ভাই আমার কথা ভাবে। পৃথিবীতে অন্ততঃ একজনও আমার কথা ভাবে। এই একটি ভাবনা আমাকে বিশ্রী রকমের একটা গ্লানি থেকে মুক্তি দিলো। রাহুলকে যেমন ভালোবাসে আনিস ভাই, যেমন মম্ পুতুল এদেরকে ভালোবাসে, তেমনি আমাকেও ভালোবাসে। আমার মনের ভেতরে গতকালের

সেই মিষ্টি অনুভবটা আবার নতুন করে ছেয়ে গেলো। আমি যেন একটা পাখি, আজ বিকেলে অগাধ নীল আকাশে মুক্তি পেয়েছি। অনেক রাত এখন, আমার এখনও ঘুম পাচ্ছে না। আনিস ভাইয়ের হাত দুটো কী স্নিগ্ধ আর নরম। এই গভীর রাতের ভেতরে আমার মুখ ঢাকতে ইচ্ছে করছে।

ঘটনা আর ঘটনা। মরণও যেন ছিলো আমার ভালো। নইলে এমন কেন হবে? খোদা এ কোন যন্ত্রণা দিলে আমার বুকে।

আনিস ভাই কেন তুমি এমন করলে? এতে যে তোমারও কষ্ট আমারও কষ্ট।

তোমার ঘরে যেতে আমার সঙ্কোচ হয় আজকাল। তুমি বই পড় না আর। পড়তে পড়তে শুধু অবাক হয়ে দেখো। তোমার দু'চোখে যে কী যাদু আছে। আমারও মনের ভেতরে কে যেন বলে, চলো, দেখে আসি। ও পড়ছে কি না। না, এখনো তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। সত্যি!!! বইয়ের পাশ দিয়ে [illegible] শুধু আমাকে দেখো আর দেখো। এ দেখা সে রকমের নয়, যে চোখে বেনুদা লুকিয়ে দেখে আমাকে। মন যেমন রাতের তারা ভরা বিরাট আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়, মুগ্ধ হয়, শুধু তাকিয়ে দেখার ইচ্ছেটা ফোটে ওর দু'চোখের তারায় তারায়। এ দেখা যেন তেমনি করে দেখা।

কিন্তু আজ কি করলে তুমি। আমাকে কি মরে যেতে বলো? আমি যে মরে গেলেও এ কথা আর কাউকে বলতে পারবো না।

আজ ঘরে টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে ওর বই গুছিয়ে রাখছিলাম। এমন সময় আনিস ভাই ঘরে এলো। বোধ হয় বাইরে বেরিয়েছিলো কোথাও। এসেই আমার এলোচুল মাথায় হাত রেখে চমকে দিলো। তারপর কাঁধে হাত রেখে বললো, আজ একটা সুন্দর বই পড়লাম, পড়বে?

আমি বুঝি না ও সব বই, কি ছাই শক্ত শক্ত বই পড়ো তুমি! আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম। আর ধীরে মুখ নীচু করে দাঁড়ালাম।

তারপর আর কথা নেই। ও পেছন থেকে দু' হাত দিয়ে ঘিরে ধরলো আমাকে। নিঃশব্দে ওর হাতের ঘের ছোট হয়ে এলো। বুকের ওপর দিয়ে দু'বাহু বাঁধা পড়লো। আমি তখনো স্থির দাঁড়িয়ে। কথা বলারও যেন কোন ক্ষমতা নেই। সব শক্তি যেন অনুভূতির কোন গহন অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। আর ঠিক সেই সময়। হ্যাঁ সেই সময়।

কাঁধের কাছে ওর নিশ্বাস এসে পড়লো। তারপরই এক টুকরো নরম আগুন। কাঁধের কাছে এক টুকরো চামড়া যেন জ্বলে গেলো। জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলাম। সারা শরীরে কি যেন ওলট-পালট হয়ে গেলো। মুখ দিয়ে দুটি মাত্র শব্দ বেরিয়ে এলো, ছি, !

কে যেন বলে উঠলো মনের ভেতরে—অন্যায়, এটা ভয়ানক অন্যায় তোমাদের। বার বার নিজেরই মনে ধমকে উঠলো, এ কি করছো তোমরা!

ভাবলাম, আর কান্না পেলো আমার। কেন এমন করলাম আমরা? এমন কিছু করবার অধিকার তো তোমারও নেই, আমারও নেই। তবু কেন এমন হয়ে গেলো আমাদের মন। আনিস, এ কোন যন্ত্রণার আগুন ছুঁইয়ে দিলে শরীরে? মনে যে শুধু গ্লানি জমে উঠছে প্রতিটি প্রহরে। ভাবছি আর ভাবছি। তুমিও তো কষ্ট পাবে এরপর। কেমন করে তোমার ঘরে যাবো আমি আর। কেউ যদি জানতে পারে তাহলে যে মরণ ছাড়া অন্য কোন গতি থাকবে না আমার। খোদা, আমি কেন জন্মের পরই মরে গেলাম না। দুনিয়া থেকে একটা জঞ্জাল অন্ততঃ কমতো। বারবার আমার মনের ভেতরে কেউ যেন প্রার্থনা করলো, হে বিধাতা, আনিস ভাই যেন কষ্ট না পায়। আমি তো জানি, এ ঘটনার পর ওর নিজেরই মনে গ্লানির অন্ত থাকবে না।

হায়রে! মরণই ছিলো আমার ভালো। আজীবন আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে, কেউ যেন আমার এই কষ্টের দিনেও বেঁচে থাকতে বলে,

তবু আমি নিজেকেই বলি, মরণই যে ছিলো ভালো। আনিস ভাইয়ের কথা যখনই মনে হয়, তখনই বলি। আর ওর কথা মনে হয় সব সময়, সব সময়।

আমার শরীরটাই হয়েছে কাল। বেনুদা কোন কোন দিন লুকিয়ে দেখে আমাকে। আমি জানি. বুঝতে পারি, ওকে চোখে না দেখতে পেলেও। সব মেয়েই নাকি পারে। ওর চোখের ভেতরে যেন একটা সাপ আছে। যে কেবলই আমার শরীরের চারপাশ দিয়ে তার ঠাণ্ডা দেহ নিয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরতে চায়।

সেদিনের সেই ঘটনার পর আনিস ভাই আসে না আর বাড়ীর ভেতরে। আমার কাছে এসে দাড়ায় না। দূর থেকে আমাকে দেখে সরে যায়। বুঝতে পারি অস্বস্তি আর গ্লানিতে ওর সারা মন ছেয়ে আছে। নিজেরই ওপর বোধ হয় তার শুধু ঘৃণা হচ্ছে। ক'দিন ধরে ওর খাওয়া দাওয়ার ঠিক নেই। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, মা শুধালো, ছোট আপা ডাকলো কারুর কথায় কান দিলো না। একদিন ও কোথায় যেন চলে গেলো। ক'দিন থেকে আর ওকে দেখা যায় না। বাড়ীর কেউ সঠিক জানে না কোথায় গিয়েছে। কেউ বলে রংপুর, কেউ বলে ঢাকা, কেউ বলে মফঃস্বলে এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে।

ওর জন্যে আমার দিনরাতের সব ভাবনা। যদি এই যন্ত্রণার সময় ওকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম, যদি বোঝাতে পারতাম—ওর কোন দোষ নেই। এ সব ঘটনার জন্যে দায়ী থাকে মেয়েরাই। তা'হলে আবার স্বাভাবিক হতে পারতো। কিন্তু এ সময়ে কোথায় পাবো ওকে আমি।

শুধু ভাবছি ক'দিন ধরে। আজ বেনুদা অপমান করলো আমাকে। শত্রু কাল হয়েছে আমার এই শরীরটা।

জানতাম বেনুদা আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে। কিন্তু সে কথা সব সময় খেয়াল রাখতে পারিনি। আমার এই ভাবনার দিনে অন্য দিকে মন দেবো কেমন করে! দেখেও দেখিনি কখন মনু-এর

খিদে পায়, কখন পুতুল কাঁদলো, কখন এলো বেনুদা, কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো বারান্দায় আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে — কিছু খেয়াল ছিলো না আমার। কেননা আমি কান পেতে ছিলাম সর্বক্ষণ বাইরের দিকে। কখন দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনতে পাবো। কখন একজোড়া ক্লান্ত পায়ের পরিচিত শব্দ ধীরে ধীরে উঠে আসবে বারান্দায়, তারপর হারিয়ে যাবে ভেতরের ঘরের চারটে দেওয়ালের ভেতরে।

তখন বাড়ীটা নির্জন। ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। বেনুদা এলো। ও রোজ আসে। হ্যাঁ, প্রায় রোজ। এসে মা'র সঙ্গে গল্প করে, মম আর পুতুলের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে তারপর চলে যায়। ওর থাকবার সময়টা সমস্তক্ষণ ওর চোখে আমি দেখেছি, কি যেন খুঁজছে ও। আজও বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাকে দেখে হাসলো। তারপর এগিয়ে এলো দরজার দিকে, যেন ঘরে ঢুকবে। আমি একদিকে সরে গেলাম। আমাকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় একমুহূর্ত ও দাঁড়ালো, আমার শরীর ঘেঁষে। তারপরই ছিটকে পড়তে হলো আমাকে। ওর একটা হাতের কতকগুলি ক্লেদাক্ত আঙুল আমার বুকের ওপর চেপে বসতে চাচ্ছিলো।

আমি কয়েক পা পিছিয়ে ওর দিকে তাকাতেই ও নির্লজ্জের মতো হাসলো। বললো, কি হলো তাতে আর! ও-সব কিছু না, মনে কোরো না কিছু।

আমার বলবার মতো কথা নেই কোন। ক্রোধে ঘৃণায় আর প্রতিহিংসায় আমি একাকার হয়ে গিয়েছি তখন। প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিলো, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা কামড়ে ধরি।

আর সেই মুহূর্তের পর নিজেকে আমার অশুচি মনে হতে লাগলো। আমাকে স্নান করতে হলো। সারা গায়ে সাবান মাখলাম তবু আঙুলের ঘৃণ্য স্পর্শ কিলবিল্ করতে লাগলো অনুভূতির মাঝখানে।

স্নানের পর শান্ত হতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোথায় শান্তি!

ধরে তখনও মা'র সঙ্গে বেনুদা গল্প করছে। ওর প্রত্যেকটা স্বর আমাকে কেবলি একটা ঘৃণার মধ্যে এনে ফেলছে। ঘৃণা আর ঘৃণা, বাড়ীর সবাইকে ঘৃণা করতে ইচ্ছে করলো আমার।

আনিস ভাইয়ের জন্যে সারা দিনরাতের এতো যে ভাবনা—ঘৃণার এই প্রবল স্রোতে সেই ভাবনাও আবিল হয়ে উঠতে লাগলো। আনিস ভাইয়ের ওপরও ঘৃণা হতে লাগলো। বেনুদা আর ওর মধ্যে পার্থক্য কোথায়! সবাই তো আমার এই রক্তমাংসের শরীরটার দিকেই হাত বাড়িয়েছে। আমার এই আঠারো বছরের বয়সটাকে অভিশপ্ত করে তুলতে চেয়েছে। কাকে আমি শ্রদ্ধা করবো, কাকে আমার ভালো লাগবে।

বাতুল, ছোট আপা এরা সম্পর্কে ভাই বোন হয় আমার। কিন্তু কই এরা তো আমাকে এ-বাড়ীতে চায় না। বাবা'ও যে এ বাড়িতে রাখছেন আমাকে সেও তো রাজবর্মে মা'র সাহায্য হবে বলেই। মা'ই বা কখন আমাকে আপন করে কথা বললো? সবাই স্বার্থ খুঁজছে। লোভ আর ঘৃণা—এ ছাড়া যেন এদের আর কোন অনুভূতি নেই।

সারা বিকেল আমার একাকী কাটলো। কারুর সঙ্গে কোন কথা বলতে পারলাম না। বেনুদা'র কি সাহস, আমাকে ঘরে ডাকলো, পান সেজে দেয়ার জন্যে। ওর ডাকে সাড়া দিলাম না।

রাতে, গতকাল রাতে, আমাকে নিয়ে আর এক ঘটনার সূত্রপাত হলো। জানি না ছোট খালাই আসলে সূত্রপাত করে গিয়েছিলেন কি না।

আকাশে তখন অনেক তারা ছিলো। হাওয়া দিচ্ছিলো বাইরে। বাইরের অশ্বথ আর লিচু গাছের পাতা কাঁপার সরসর শব্দ বয়ে যাচ্ছিলো। আমি জেগেছিলাম। ঘুম আসছিলো না। শুধু শূন্য একটা অনুভূতি। রাতের অন্ধকারের মতো গভীর এবং শূন্য। আলো নেই, কোলাহল নেই। শান্ত আর রহস্যময় শূন্যতার মধ্যে আমি যেন মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম।

এমন সময় পাশের ঘরে মা আর বাবার কথা কানে এলো। আমি প্রথমটা শুনেও শুনতে চাইনি। কিন্তু আমার নাম শুনে আমাকে সজাগ হতে হলো।

শুনলাম, মা বলছে, আর দেরি নয়, মঞ্জুকে ওর দাদুর ওখানেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কেন?

এমনি। ওকি তোমার সংসারে বাঁদিগিরি করতে এসেছে নাকি? ওর কি লাভ এখান থেকে। ওর দাদুরা ওর বিয়ে ঠিক করছেন, হলে হয়ে যাক। নইলে কে দেবে ওর বিয়ে।

আহা কি দরকার এতো তাড়াতাড়ি। বাবা যেন বোঝাতে চাইলেন।

মেয়ের বয়স বসে নেই। ও বয়সের অনেক আগে আমি মা হয়েছিলাম। তোমরা তো আর বিয়ে দেবে না। ওর যাওয়াই ভালো।

আহা বুঝছ না কেন, বাবা যেন হাত নেড়ে বোঝাতে চেষ্টা করছেন, ফরিদার বিয়ে না হলে—ওর বিয়ে কেমন করে দেয়া যায়।

সে তো যাবেই না। মা'র স্বরে তীব্র শ্লেষ, তুমি তো মেয়ের বিয়ের কথা ভাবো না। লেখাপড়া শিখিয়ে মেয়েকে বিদ্যাধরী বানাতে চাও। আমার মেয়ের বিয়ে আমি আগেই দেবো।

যা ভালো বোঝ করো— বাবার স্বর ক্লান্ত।

তারপরই মা'র একটানা কথা। বুড়ো হয়ে যাচ্ছো তবু তোমার খাম-খেয়ালী গেলো না। একটা কিছু করো।

কি করবো?

তবে কি তোমার ছেলেমেয়েদের দেখা-শোনা করার জন্যে আমি আমার জীবনপাত করবো! ওরা আমার কে? মা'র কণ্ঠস্বর তীব্র হয়ে উঠলো।

একটু পর দরজা খোলার শব্দ হলো। বাবার ক্যাম্প-খাট পাতার শব্দ পেলাম বারান্দায়।

মা ঘরের ভেতরে তপন ও গজ গজ করছে, যাও না, কোন চুলোয় যেতে পারো দেখি। আমাকে মারবার জন্যে এনেছো তুমি এখানে। হ্যাঁ মেরে ফেলার জন্যে।

এমনই হচ্ছে বছর খানেক ধরে। অথচ যখন প্রথম এসেছিলাম এ বাড়ীতে মার চোখে তখন [illegible] সব [illegible] ছায়া দেখা [illegible]। মনে হয়েছিল, মা'র [illegible] কোন [illegible] নেই। তারপর থেকে ধীরে ধীরে কোন [illegible]। অমন তিক্ততা টেরও পেলাম না। কোন [illegible] জনের মাঝখানে যেন একটা অদৃশ্য দেয়াল উঠে দাঁড়া[illegible]। আর [illegible] দিন সেটা বেড়েই চলেছে।

মনে হয়েছিলো সবাই [illegible] সম্পর্কের মধ্যে। মা, বাবা, [illegible]। [illegible] সবাই এরা। [illegible] ভাই, রাহুল আর আমি [illegible]। এই যে সম্পর্কের বাঁধন [illegible], এ যেন শুধু বাইরের। [illegible] ভেতরে সবার চোখে সন্দেহের ছায়া। সবাই একে অন্যের মনে মনে ঘৃণা করছে। এদের সব সম্পর্কের মূলে কেউ যেন ভেতর থেকে অন্যকে কেটে কেটে বাদ দিয়ে রাখছে।

আর যতো যন্ত্রণা, যতো কষ্ট সব বোধ হয় এই জন্যেই। একে অন্যকে জানতে চেষ্টা করেও পারছে না। একে অন্যের দিকে হাত বাড়ায়—কী যেন এক পরম প্রত্যাশায়। কিন্তু কারো দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। এ এক আশ্চর্য বাড়ী। যেন শহরের হোটেল। পাশাপাশি থাকছে এরা, এক সঙ্গে বাস করছে, ফুটে উঠছে জীবনে—কিন্তু কেউ কাকেও চিনতে পারছে না, জানতে পারছে না।

এ সবই তো গেলো গতকালের কথা। আমার কেবলই চিন্তা হচ্ছে, ছোট আপা হয়তো একদিন বাবার সঙ্গে ঝগড়া করবে। কিম্বা রাহুল হয়তো একদিন বাবার সঙ্গে ঝগড়া করবে।

আমি যদি এ-বাড়ীর কেউ হতাম। যদি ওরা আমাকে ছোট আপার মতো আপন করে দেখতো। সবাই আমার অধিকার স্বীকার করে নিতো, ওদের সবার হাত ধরে আমি ফেরাতাম। সবাইকে ভালোবাসতে বলতাম। বোঝাতে চেষ্টা করতাম। যখন বাবা আর মা একবারও মুখোমুখি হতো, বলতাম, তোমরা ঝগড়া করো না। সুখী হতে চেষ্টা করো। জীবনের চারপাশে অনেক যন্ত্রণা, তোমরা মনের দিক থেকে অন্তত সুখী হতে চেষ্টা করো।

কিন্তু পারি না। আমাকে কেউ বিশ্বাস করবে না। আমার অমন মিনতি দেখে পাগল ভাববে। আমাকে কেউ বুঝবে না। না বাবা, না মা, না ছোট আপা, না রাহুল, না আর কেউ। ওদের যদি মা থাকতো।

আমার চারপাশে সারাদিন কতো ঘটনা ঘটে। আমাকে দেখতে হয়, শরীক হতে হয় সে সব ঘটনায়। কতো কাজ কতো সাংসারিক ভাবনা। হয়তো অন্য কোন কিছু ভাববার অবসর পাই না। কিন্তু রাতে, যে মুহূর্তে আমার অবকাশ হলো, সেই মুহূর্তে মনে পড়লো আনিসের কথা। এই এখন ডায়েরী লেখার সময় কেবলি ভাবছি। আনিস ভাই ফিরে এস তুমি। আমাকে যা ইচ্ছে শাস্তি দিও। তোমার কোন দোষ নেই। আমারই ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে পাপ। আমার অজ্ঞাতেই ও আমাকে দিয়ে লোভের পশরা সাজায়। আমি জানি না কখন, কি ভাবে। কিন্তু তবু ও আমাকে পুতুল বানিয়েছে। এই শরীরের ভেতরেই রয়েছে আমার সব চাইতে বড় শত্রু। আনিস ভাই ফিরে এসো।

রাহুল আমাকে দেখতে পারে না। অপমান করছে যখন তখন। কথায় কথায় বলে, কেন আছিস তুই এখানে? চলে যেতে পারিস না?—ওর কণ্ঠে শ্লেষ বিরক্তি ঘৃণা হিংসা সব এক সঙ্গে শুনতে পাই।

রাহুলের কথা যখন প্রথম শুনি তখন ভেবেছিলাম রাহুলের মতো শান্ত সুন্দর ছেলে বোধ হয় না। ছোট আপা ওর সম্বন্ধে ভারি সুন্দর গল্প বলেছিলেন। সেটা ওর নাম রাখার কাহিনী।

বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্ম হয় ওর। গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন সেটা। আনিস ভাই ওর নাম বুদ্ধ রাখতে চেয়েছিলো। সবাই তখন আপত্তি করে। নামটা বিচ্ছিরি, বড় হলে ওর বন্ধুরা ওকে বুদ্ধু বলে ক্ষ্যাপাতে পারে। তখন বেছে বেছে নাম রাখা হলো রাহুল। গৌতমের ছেলের নাম। ওর মা খুশি হয়েছিলেন ছেলের এই নাম হওয়াতে। ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প করতেন, এই ছেলে আমার লোভ হিংসা, রাগ—এ সব থেকে অনেক দূরে থাকবে। আর ছোট-বেলাতে ও অমনই ছিলো। সুন্দর, শুভ্র, শান্ত আর সহজ। ছোট আপা শেষটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, কিন্তু এই ক'টা বছরে ও যে কেন এমন হলো, কে জানে।

ও যখন গালাগালি করে তখন সহ্য করতে চেষ্টা করি। কিন্তু মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে যখন ও বলে কেন এখানে আছিস তুই, চলে যেতে পারিস না?

তখন আমি আর সহ্য করতে পারি না। বলি, চলে তো যাবেই। তোদের এখানে চিরকাল থাকতে আসেনি। তোরাই তো ডেকে আনিয়েছিস এখানে, এখন লজ্জা করে না?

আমার কথায় কী থাকে জানি না। ও ক্ষেপে ওঠে একেবারে। বলে, তোর মরে যাওয়া উচিত। তোর বাবা নেই, মা নেই, বাঁদীর মতো এ বাড়ীতে আছিস—তুই মরে গেলে শান্তি পাবি।

রাহুলের কথা আমাকে কাঁদায় না। যদি আর কেউ বলতো বাবা কিম্বা ছোট আপা তাহলে হয়তো মনে লাগতো। কিন্তু রাহুল যে আমারই মতো একাকী। ওকে কেউ ভালোবাসে না। ওর বাবা থেকেও নেই। ভাই বোন থেকেও নেই। চারদিক থেকে শুধু ও আঘাত পায়। ও যে সবাইকে আঘাত করবার জন্যে আক্রোশে ফুলে

উঠবে এ আর আশ্চর্য কি। ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়। একদিন কাছে গিয়ে বললাম, আচ্ছা রাহুল, কেন আমার ওপর তোর এতো রাগ? আমি কি কিছু করেছি তোর? মিছামিছি রাগারাগি করে এতো কষ্ট পাস কেন তুই। আয় না আমরা বন্ধু হয়ে যাই।

আমার কথা শুনে অদ্ভুত চোখ তুলে তাকালো রাহুল। সেই অন্ধকার দু'চোখের আড়াল দিয়ে যেন স্নিগ্ধ আলো ফুটলো একটু একটু করে। কিন্তু সেও মুহূর্তের জন্যেই। পরক্ষণেই ওর চোখ আবার অন্ধকার হয়ে উঠলো। চিবুকে দৃঢ় রুক্ষতার আভাস দেখা গেলো। বললো, নে রাখ্ অতো আদিখ্যেতা অন্য কারুকে দেখাস।

ও চলে যাওয়ার আগেই মা এসে দাঁড়িয়েছিলো পেছনে।

আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ডাকলো আমাকে। রাহুল পাশ কাটিয়ে চলে যেতেই মা জিজ্ঞেস করলো, কি করছিস এখানে।

রাহুল আমার সঙ্গে কেন ঝগড়া করে তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

কি দরকার তোর ওসবে! বড় বাড় বেড়েছে না? এ সব কি বেহায়াপনা। ফের যদি তোকে ওর সঙ্গে কথা বলতে দেখি—তোকে আস্ত রাখবো না আমি। জবাই করে রাখবো ঘরের ভেতরে।

আমি মুখ নিচু করে চলে আসছিলাম। সেই মুহূর্তে মনে পড়েছিলো ছোট বেলাকার একটা দৃশ্য। নিঝুম দুপুরে এক ঘরে মা আর কবির চাচা গল্প করছে। কথাটা মনে এলো আর চলে এলাম। আমি কিছু বলতে পারলাম না। কি বলবো আমি? এরা কেউ আমার আপনার নয়। কেউ না। সবাই শুধু সন্দেহ নিয়ে আছে। রাহুলের কথাই ঠিক, আমার মরে যাওয়াই ভালো। হ্যাঁ মরে যাওয়াই উচিত। আমি কোথায় যাবো! আমার কোন আশ্রয় নেই। কেউ আমাকে চায় না।

চলেই যাচ্ছিলাম। বারান্দায় আবার থমকে দাঁড়াতে হলো। মার কথা তখনও ফুরোয়নি। গজ গজ করে বলছেন। কেন বেনুর উপর

রাজুনের এতো আক্রোশ, এখন বুঝতে পারছি, আসুক আজ ওর বাবা। ওকে যদি বাড়ী থেকে না তাড়িয়েছি তো আমার নাম বদল রাখবো।

আমার মনের ভেতর থেকে শুধু একটা ধিক্কার বেরুলো, ছিঃ মানুষের মন এতো ছোট কেন? কেন খালি সবকিছুর একটাই অর্থ দেখতে পায় এরা।

এ বাড়ী অসহ্য হয়ে উঠছে আমার কাছে। হ্যাঁ এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু আর যাবো বা কোথায়। মনের ভেতরে রাগ মেশানো একটা কান্না ফুলে ফুলে উঠছে। কিন্তু কাঁদতেও পারছি না। আমার এ কান্না আমি কোথায় লুকাবো। আর কেঁদে বা [illegible]। এমনই তো আমার জীবন।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর খাতা খুলে ইংরেজী লিখতে বসলাম। আমার ইংরেজী লিখতে ইচ্ছে করে। অবসর সময় আমার কল্পনার বন্ধুদের ইংরেজী ভাষায় সুন্দর সুন্দর শব্দ সাজিয়ে চিঠি লিখতে ভালো লাগে। চিঠি লিখতে লিখতে হঠাৎ স্মরণ হলো, যদি দাদুকে অথবা চাচাকে [illegible] চিঠি লিখি তাহলে হয়তো ওঁরা আমাকে নিয়ে যাবেন এখান থেকে। সারা দুপুর বসে বসে চিঠি লিখলাম। নিচে [illegible] ছোট আপার কাছ থেকে খাম চেয়ে নিয়ে এলাম। ঠিকানা লিখে চিঠি বইয়ের ভেতর লুকিয়ে রাখলাম। সময় মতো ডাক বাক্সে ফেলে দেবো।

মা বসেছিলো অদূরে। [illegible] আর পুতুলের জামা সেলাই করছিলো। মার পাশে গিয়ে বসলাম। জানালাম, আমি দাদুর ওখানে যাবো মা। খুব ইচ্ছে করছে যেতে। কতোদিন কোথাও যাই না।

মা শুনলো চুপ করে। তারপর বললো, আচ্ছা দেখি জিজ্ঞেস করে তোর বাবাকে। উনি কি বলেন।

ঐ পর্যন্ত। আর কথা বলতে পারলাম না।

আমার দু'মাসের স্কুল জীবনের বন্ধুরা বেড়াতে এলো।

ঈশ, আজকালকার মেয়েরা কি ভীষণ পাকা। রঞ্জু তো অতটুকু মেয়ে। ও এক পাশে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোর আনিস ভাই কলেজে চাকরি করবে না?

না, কেন? পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

করলে আমাদের তো ওর কাছে পড়তে হবে, তাই জিজ্ঞেস করছি। একটু থেমে আবার বললো, আচ্ছা, ও কি প্রেম করছে কারো সাথে?

ওর কথা শুনে, জানি না কেন, বুকের ভেতরে দুরু দুরু কাঁপুনি শুরু হয়ে গেলো আমার। প্রেম! আশ্চর্য হতে চেষ্টা করলাম, কোথায়? জানিস নাকি কিছু?

না, না, আমরা কেমন করে জানবো? রঞ্জু একেবারে লক্ষ্মী মেয়েটি হয়ে যেতে চাইলো। নাসিমা এতোক্ষণ চুপ করে ছিলো। সোৎসাহে এগিয়ে এসে বললো, জানিস না? ক'দিন ধ'রে তোর আনিস ভাই ওর মামার বাড়ীতে যেতো। ওর মামাতো ভাই আহসানের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব তোর আনিস ভাইয়ের। ওদের বাড়ীতেই রঞ্জুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

আগাগোড়াই ব্যাপারটা আমার খারাপ লাগছিলো। ভালো করে কথা বলতে পারলাম না। শুধু জিজ্ঞেস করলাম, ও তোর সাথে কথা বলে?

হ্যাঁ, রঞ্জু মাথা নাড়লো।

তোকে বলেছে ও তোকে ভালোবাসে? নাসিমা হঠাৎ মুখিয়ে উঠে প্রশ্ন করলো।

হ্যাঁ, মাথা নাড়লো আবার রঞ্জু। তারপর বললো, আমাকে চিঠি লিখেছে।

আমার হাসি পেলো। কী চালবাজ মেয়ে রে বাবা! এতো মিথ্যে কথাও বলতে পারে! হাসি চেপে জিজ্ঞেস করলাম, কবে দেখেছিস তুই?

কালই তো গিয়েছিলো।

এবার হেসে ফেললাম। বললাম তবু অতি কষ্টে, আনিস ভাই এক সপ্তাহ ধরে নীলফামারী নেই।

বাঁচলাম, ওরা চলে গেলে। মনের ভেতরে কী যেন একটা ঝড় এসে গিয়েছিলো। হ্যা, ঝড়। কোনো মানে হয় না, তবু। একটু আগে মনে হয়েছিলো ওদের সবাইকে আমি তাড়িয়ে দেবো। কিন্তু ঝড়টা শেষ পর্য্যন্ত এলো না। মেঘের গুড়্‌গুড়্‌ ডাক শুনিয়েই দূর থেকে চলে গেলো।

আনিস ভাই আজো এলো না। ও আসবে কিনা তাই বা কে জানে। চাচা যদি নিতে আসতো, তাহলে চলেই যেতাম আমি। একমাস পর চাচা আসবে নিয়ে যেতে। এই একট মাস কেমন করে কাটাবো এই যন্ত্রণার পুরীতে।

রাহুল আজ বাড়ীতে আসে নি সারাদিন।

তখন সকাল। ঘুম থেকে উঠে বাইরের দিকে এলাম। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিলো। সারা শরীর জুড়িয়ে গেলো হাওয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তখন ফর্সা হয়েছে শুধু, রোদ ওঠেনি। পাশের আম গাছ থেকে মুকুলের গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়।

ঘরের ভেতরে ইজি চেয়ারে [illegible]। জানালা দিয়ে আবছা দেখা যায় শুধু। হঠাৎ রাহুলের গলা শুনলাম, ও ডাকলো আমাকে। ঘরের ভেতরে গেলাম। ও ইজি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।

জিজ্ঞেস করলাম, কাল সারাদিন কোথায় ছিলি? কখন এসেছিস?

বাইরে বাইরে ঘুরেছি কাল সারাটা দিন।

একটু পর কি যেন ভেবে ও মাথা তুলে আমার দিকে তাকালো। তারপর বললো, আমাকে মাফ করবি?

মাফ, কেন? বিস্মিত হলাম। ঠিক বুঝলাম না ব্যাপার!

হ্যা, আমি শুধু শুধু তোকে খারাপ কথা বলি। আমরা বন্ধু হ'তে পারি না? ও সহজ ভাবে দেখলো এতক্ষণে আমার দিকে। কেন পারবো না। আমি ওর হাত ধরলাম, তাছাড়া আমি তোর বোন।

রাহুল অদ্ভুত সুন্দর আর স্বচ্ছ হাসলো। ওর না-ঘুমানো ঘোলাটে চোখে অপরূপ আলো এসে লাগলো।

সকালের আলো তখন জানালার ভেতর দিয়ে ঘরের দেয়ালে এসে পড়েছে। ওকে বললাম, তোর পরীক্ষা সামনে, এবার পড়াশোনায় মনোযোগ দে। মিছিমিছি কষ্ট পাস কেন এত ?

আমার ভালো লাগলো। রাহুল হয়তো আর কষ্ট পাবে না। হয়তো বেঁচে যাবে একটা যন্ত্রাণা থেকে। আমারও নিজের ভালো লাগলো। কি সুন্দর এমনি ভাবে কারো বন্ধু হয়ে যাওয়া, কেমন অপরূপ এমনি এক জনের বোন হওয়া। মনের ভেতরে কোথায় যেন আশ্বাস আর স্নিগ্ধতা ছেয়ে এলো।

কিন্তু ঘটনা যে মানুষকে স্থির থাকতে দেয় না। যে সুন্দর সকালটা আমার ভালো লাগছিলো। সেই সকালটা মরে গেলো দুপুরেই। হ্যাঁ একেবারে দুপুরেই আমার সব ভালো লাগার সমাধি হয়ে গেলো।

ছোট আপা বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বসলো। ব্যাপারটা তুচ্ছ, একেবারেই তুচ্ছ। ছোট আপার মায়ের সেই ফটো এনলার্জের ব্যাপার। ছোট আপা কয়েক দিন ধরেই বাবাকে বলছিলো, সে ফটো থেকে একটা পোর্ট্রেট করিয়ে নিতে। ঢাকায় পাঠিয়ে কোনো আর্টিস্টকে দিয়ে পোর্ট্রেট করাতে হবে। ছোট আপা এখনই পাঠাতে চায়। বাবা এবং রাজী হচ্ছেন না হাতে এখন টাকা পয়সার অভাব। আর সেই নিয়ে ঝগড়া। ছোট আপা এক সময় বলে উঠলো তুমি স্বার্থপর, নিজের এতোটুকু কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা নেই তোমার। নিজের সুখের জন্যে বুড়ো বয়সে তুমি বিয়ে পর্যন্ত করতে পারো। ছেলেমেয়ে কারো সুখ-সুবিধার দিকে দেখতে পারো না তুমি। এখন অন্ধ হয়ে গিয়েছো একেবারে ?

বাবা দোকান থেকে ফিরে এসেছিলেন খানিক আগে। মেজাজ ঠিক ছিলো না। বললেন, তবু তো এই স্বার্থপর অন্ধ লোকটাকেই বাবা বলে ডাকতে হবে। যদি বাবা বলে ডাকতে অসুবিধা হয়, ডেকো না। এ বাড়ীতে থেকো না। রাস্তা খোলাই আছে।

এবং কি আশ্চর্য, ছোট আপা একটু পরে স্যুটকেশ হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলো বাড়ী থেকে।

মা দেখলো, বাবা দেখলো, আমি দেখলাম—কিন্তু কেউ কিছু বললাম না। এ যে হবে আমি জানতাম। এর সূত্রপাত অনেক আগে। আমি এ বাসায় আসারও অনেক আগে।

ছোট আপা পড়াশোনা করে। কিন্তু আমি জানি পড়াশোনার দিকে ওর ঝোঁক নেই। ওর ইচ্ছে ঘর সংসার করার। ওর বন্ধুদের এক এক করে বিয়ে হয়ে গেলো। ছোট আপা কারো বিয়েতে যেতো না নিমন্ত্রণ পেয়েও। আর ওদের বিয়ের দিনগুলোতে সারাদিন বাড়ী থেকে বেরুতো না। আর খুব রেগে থাকতো। ও ছেলেদের দেখতে পারতো না। বলতো, ছেলেরা সবাই শয়তান, ওদের কখনো বিশ্বাস করবো না। বাবা, ভাই, কারুকে না।

আর কতোদিন ও পাশের ঘরে অনেক রাত অবধি জেগে থেকেছে। পরদিন বাবাকে বলে গেছে, আমার সারারাত মাথা ধরেছিলো একটুও ঘুম হয়নি।

বাবা শুনেছেন, তারপর চুপ করে চলে গিয়েছেন। বাবা বুঝতেন। কিন্তু কোন উপায় দেখতে পাননি। ছোট আপার বিয়ের জন্যে কম চেষ্টা করেন নি। কিন্তু কি করবেন। ছোট আপার রংটা ফর্সা নয় বলে সব জায়গা থেকেই ফিরে আসতে হয়েছে। টাকার চমক দিয়ে রংটা যে ঢেকে দেবেন তারও সামর্থ্য ছিলো না তার কাছে। আর চার পাশের এই ব্যর্থতা, হতাশা, সমস্ত ব্যাপারটাকে এমনি একটা বিশ্রী অবস্থায় টেনে আনলো।

রাহুল ছিলো না। যখন এলো তখন বললাম, যা শীগ্‌গির ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়। রাহুল কিছু বললো না, চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে থেকে কান্না চাপতে চাপতে আমার কাছ থেকে সরে গেলো।

ছোট আপার জন্যে কষ্ট হলো আমার। আর নিজের জন্যে ভয়। আর এ ভয়টা খুব অস্পষ্ট। ছোট আপার মধ্যে, অস্পষ্ট

হলেও আমারই একটা চেহারা দেখতে পেলাম। আমিও হয়তো ছোট আপার মতো হয়ে যাবো এক সময়। আমারও যদি বিয়ে না হয়, আমারও যদি পড়াশোনা নিয়ে থাকতে গিয়ে শুধু ক্লান্তি লাগে। আর ছেলেদের কারুকে যদি কোনদিন বিশ্বাস না করতে পারি, তাহলে আমিও একদিন বেরিয়ে যাবো। এমনি একটা অস্পষ্ট ধারণা আমার নিজের সম্বন্ধে মনের ভেতরে পাক খেয়ে উঠলো।

কিন্তু কেউ কিছু করতে পারে না এজন্যে। বাবাকে ছোট আপা ঘেন্না করে, ঘেন্না করে মা'কে, আনিসকে, এমন কি রাহুলকেও। আর আমাকে তো বাড়ীর লোক বলেই মনে করে না ও। ওর কী যেন একটা অভিযোগ রয়েছে। সে অভিযোগ ও মুখ ফুটে কোনোদিন করতে পারেনি। আর পারেনি বলেই মনে মনে ও হিংসায় জ্বলে উঠেছে। এবং ঘৃণার শেষ ধাপে পৌঁছে শেষটা ঝাঁপ দিলো সম্মুখের অগাধ অনিশ্চিত ভবিষ্যতে।

শুধু কি তাই! শুধুই কি ঘৃণা আর হিংসা? না শুধু তা নয়। তার সঙ্গে আছে নিজের সুখ আর সাধ নিয়ে জীবনে বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষা। আর সে আকাঙ্ক্ষাই ওকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গেলো নিশির ডাকের মতো।

এখন হয়তো, স্কুলের দিদিমণি হবে—কিম্বা হয়তো বিয়ে করবে কারুকে। এমন তো কতো হয়। হে খোদা, যেন তাই হয়। ছোট আপা জীবনে যেন সুখী হয়।

দীর্ঘ স্রোতের পথে একটুখানি যেন আবর্ত। চৌধুরী বাড়ীর গতানুগতিক জীবন ছোট আপার চলে যাওয়াতে একটুখানি চঞ্চল হলো তারপর আবার গতানুগতিক ধারায় চৌধুরী বাড়ীর জীবন চলতে থাকলো। কারুরই মনে থাকলো না—কে আছে এ-বাড়ীতে, কে নেই।

এমনই নাকি হয়। একবার দূরে চলে গেলে তার কথা মনে থাকলেও কেউ তার জন্যে ভাবতে বসে না। ও নেই, কিন্তু এই কথা কারো বুকে বাজবে না।

বেনুদার লোভ থেকে কবে যে মুক্তি পাবো।

একমাস পর আবার আমার লিখবার মত কথা হলো। চাচারা কেউ আমাকে নিতে আসেন নি। ওদের সময় হবে না এখন। যদি সময় হয় তা'হলে সেই বৈশাখে। ওঁদের ব্যবসা, নিয়ে ওঁরা এখন খুব ব্যস্ত। আমি কী করতে পারি? জোর করে নিজের দাবী জানানো যে সে অধিকার আছে কি না তাতো বুঝতে পারিনি কোনদিন। আর দাবী কার কাছেই বা জানাবো। ও বাড়ীতেও তো আমাকে ওদের অনুগ্রহের ওপরই বাস করতে হয়।

একেক সময় মনে হয় মানুষের বোধ হয় ভিখিরী হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়াই অনেক ভালো। আমার দরকারী জিনিষের কথা কারুকে বলতে পারি না। নিজেকে কেমন যেন ছোট মনে হয়। মনে হয় আমি যেন ভিক্ষা চাইছি। এমন মনে হওয়া উচিৎ নয়,

ম বুঝি। কিন্তু তবু আমার হয়।

আর হবেই বা না কেন? বাবার কাছে চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করেন মাকে, জিনিসটা সত্যিই আমার দরকারী কি না। আর দরকারী হলে যদি এনে দেন, কতো দাম হলো সে কথাও শোনান। আমাকে নয়, মাকে। মার কাছে বলেন, মা চুপ করে শোনে। আর আমার ওপর মিছামিছি রাগ করে। সময় সময় আমাকে গালাগাল করতে থাকে। আমি শুনি। চোখ ফেটে পানি পড়তে চায় আমার। কিন্তু কি করতে পারি। এ শরীরটাই যে হয়েছে আমার কাল। এর জন্যে কাপড় জামা দরকার। আর অসুখ করলে বেঁচে ওঠার জন্যে আবার অষুধেরও যে প্রয়োজন।

এদিকে বেনুদা রোজই আসছে। ওর দৃষ্টি এখনও আমার শরীরের চারপাশে পিচ্ছিল হয়ে কিলবিল করতে থাকে। কেবলি মনে হয় আমার শরীরে কী যেন ঘৃণ্য আর কিলবিলে জিনিস লেগে থাকছে। ওর চোখ তাকিয়ে থাকে আমার পায়ে পায়ে। সম্মুখে দাড়ালে স্পষ্ট দেখতে পাই ওর চোখ জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে।

স্নান সেরে সেদিন ঘরে ঢুকেছিলাম। চুল ঝাড়বো, গায়ে ভালো করে জামা দেবো। তখন শুধু শাড়িটাই জড়ানো। আমি উঠোন পেরিয়ে ঘরে ঢুকবো এমন সময় বারান্দায় ওকে দেখলাম। ওকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় শুনলাম ও নিচু গলায় বললো, তোকে দেখতে ফাইন লাগছে।

ওর কথা শুনে দাঁড়ালাম না, সাড়া দিলাম না। ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। আমার তখন বিচ্ছিরি লাগছে [illegible] নিজেকে। কেন বলে ওরা আমাকে, শুধু আমাকেই। [illegible] কি আর কোন মেয়েকে দেখেনি ওরা। কেবল এ চায় আমার [illegible]

কাপড়-জামা পরে, চুল আঁচড়ে বাইরে এলাম। [illegible] বেণুদা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

এই শোন, ও ডাকলো আমাকে।

কিছু বলবেন, কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, মুখোমুখি।

আচ্ছা মঞ্জু, ওর স্বরে কি রকম যেন অস্বাভাবিকত্ব ছিলো, ও বললো, আমি কেন এ-বাড়িতে আসি জানো না?

জানি আমার জন্যে আপনি আসেন। আমি ওর মুখের ওপর শব্দ ক'টা বললাম। আমার দু'চোখে তখন ঘৃণা ঝরছিলো।

সত্যি তোমার জন্যে তো ভাবি। ওর স্বরে এবার আবেগ ছিলো।

আমার এতো বিরক্তি লাগছিলো তখন। বললাম, আপনি যদি এমনি পাগলামি করেন তাহলে আমি বাবা আর বাবলুকে জানাবো। জুতো পিটিয়ে এসব ভূত ছাড়িয়ে দেবে।

কিন্তু কি দোষ করেছি আমি। এতো নিষ্ঠুর হতে পারো তুমি।

এমন নাটুকেপনা বরদাস্ত করা কঠিন। ওর সঙ্গে কোন কথা বলার প্রবৃত্তি হলো না। মানুষ যে মানুষকে কতখানি ঘৃণা করতে পারে সেদিন প্রথম অনুভব করলাম। কোন মানুষকে হত্যা করার আগে ও মনে যে কতখানি ঘৃণা থাকে বুঝলাম।

বুঝতাম না কি কারণে এমন হয়। তবে একটুকু বুঝতে পারতাম মা'র মনের ভেতরে কী যেন রয়েছে যার জন্যে মা কখনো সহজ হতে পারে না।

মা জানে বেনুদাকে আমি পছন্দ করি না। ওকে এড়িয়ে চলি। তবু মা আমাকে ওরই কাছে পাঠাবে। দরকারে অদরকারে ও আসবে আর আমাকে যেতে হবে ওরই কাছাকাছি।

আমি এ কথা মুখ ফুটে বলতেও পারবো না। যদি বলি, তাহলে আমাকে কতগুলো নোংরা কথা শুনতে হবে। দেখতে হবে মা'র কুটিল দু'টি চোখ।

ক'দিন আগে বেনুদাকে বাজারে পাঠিয়েছিলো। বাজার থেকে ফিরে এসে দুপুর বেলা মা'র কাছে এসে বললো, এক কাপ চা খাওয়ান খালা।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমি তখন বই পড়ছিলাম। মা চা তৈরী করতে বললো। একটু পর চা তৈরী করে পুতুলের হাতে পাঠিয়ে দিলাম।

এবং একটু পর শুনলাম, মা পুতুলকে বলছে, তুই কেন? মঞ্জু আনতে পারলো না?

মঞ্জু নিজের হাতে চা করে এনে দেবে আমাকে? তবেই হয়েছে, বেনুদা মন্তব্য করলো। ওই সঙ্গে ওর হাসির শব্দ শুনলাম।

মা কিছু বললেন না ওকে। আমার ঘরে এসে বললেন, কি করছিস?

বই পড়ছিলাম, উঠে বসলাম। মা ডাকলো, এ ঘরে আয়।

গেলাম মার ঘরে। বেনুদা আমাকে দেখে হাসলো। যাক মহারাণার দেখা পাওয়া গেলো। না হলে দুয়োর থেকেই দীন ভৃত্যকে ফিরে যেতে হতো।

কথাটা বিশ্রী। কিন্তু মা কিছু বললো না।

আমি বললাম, আপনার ওসব কথা বলবেন না আমার সামনে।

বেনুদা চোখ নাচিয়ে বললো মাকে, দেখছেন কেমন চটে গেছে।

মা বিরক্ত হলো যেন। চটবার কি হয়েছে এতো। এটুকু হাসি-ঠাট্টা না করতে পারলে ভাই-বোন সম্পর্ক কেন?

মার কথা স্তব্ধ হয়ে শুনতে হলো আমাকে। আর ভাবলাম, ভাই-বোন সম্পর্কের মধ্যে এই বুঝি স্বাভাবিক কথা? আমি ওদের কাছ থেকে সরে আসছিলাম। মা ডাকলো, কোথায় যাস? বাজার খরচের হিসেবটা নে বেনুর কাছ থেকে।

আমি কাগজ কলম এনে দিয়ে বললাম, আপনি লিখে রাখুন পরে আমি মিলিয়ে নেবো।

পরে কেন? মুখিয়ে উঠলো সেন। এক জায়গায় বসে দুই ভাই-বোনে মিলে হিসেবটা মিলিয়ে নেবে, তা না, যতো গণ্ডগোল পাকানো।

এবং একটু পর আমাকে আর বেনুদাকে বসতে হলো দক্ষিণের ঘরে। মা গেলো স্নান করতে।

তারপর দুটো কি একটা জিনিসের দাম লিখেছে কাগজে আর তখন হঠাৎ ও আমার হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে আমাকে কাছে টানতে চেষ্টা করলো। আমি হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম। বললাম, বিরক্ত করবেন না।

আহা তাতে কি হয়েছে। বেনুদা আমার বাঁধে হাত রাখলো।

আমি শুনলাম, না শুনলাম। ঠিক কী যেন ঘটে গেলো। আমার সারা শরীরে বিদ্যু ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো শুধু। বিদ্যুতের মতো আমার ডান হাত ওর কানের কাছে আছড়ে পড়লো। তার পরই আমি সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

আমাকে নিজের ঘরে এসে কাঁদতে হয়েছে। কেন যে কান্না জানি না।

বাবার ভীষণ মামলা হয়েছে। ফৌজদারী মামলা। দশ হাজার টাকা দিতে হবে একজনকে।

কি জন্যে যে মামলা, কি জন্যে যে বাবার মতো শান্ত আর নিরীহ মানুষকে এই মামলায় জড়িয়ে পড়তে হলো কে জানে। কিছুই বুঝি

না, কেউ কিছু বলে না। আর কাককে কিছু আমি জিজ্ঞেস করতে পারি না। শুধু দেখি বাবা আজকাল বাড়ীতে থাকছেন। আর দিনরাত ভাবছেন। শুধু ভাবছেন। দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মহাজন শোধ করতে পারেন নি এদিকে। সেই দেনা শোধ না করায় মহাজন দোকানে তালাচাবি লাগিয়ে রেখেছে।

নিজের দোকান থেকেও নেই। বাবা এঘর ওঘর পায়চারি করেন। কারো সঙ্গে কোনরকম কথাবার্তা বলেন না। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন মোটে ক'টা দিনে। মনে হলো বাবা যেন ফুরিয়ে যাচ্ছেন। মনে হলো, আজ হোক কাল হোক, আমার প্রথম মনে হলো, এ সংসার আর থাকবে না। চোরা স্রোতের ওপরে বালির ওপর যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়ীটা। এই স্রোতের জন্ম অনেক পেছনে। কেমন করে যে, আর ঠিক কেমন সময়ে যে এর জন্ম হয়েছে আমি বলতে পারবো না। শুধু আমি কেন, অনেকেই জানতেন না। একমাত্র বাবাই বোধ হয় এই চোরা স্রোতের কথা জানতেন।

যে ভয় ছিলো তাই হয়ে, সেই ভয়ের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে থাকবার এখন আর শক্ত পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। ভয় পেয়েছেন বাবা। হেরে যাওয়ার ভয়।

ছোট আপার অমন অমন ভাবে চলে যাওয়া, রাহুলের অমন যন্ত্রণা, আনিস ভাইয়ের নিজেকে অমন করে তিলে তিলে হত্যা—সব যেন, হয়তো সবগুলো এক সূত্রে বাঁধা। এমন কি মাও যে বাবাকে দেখতে পারে না—এও যেন সে সব ব্যাপারের একটা দিক। আমি বলতে পারি না, কিন্তু বুঝতে পারি, অস্ফুট অস্পষ্ট হলেও, বুঝতে পারি কি যেন রয়েছে ভেতরে ভেতরে অন্তঃস্রোতের মতো।

এ বাড়ী ভেঙে যাচ্ছে অথচ এ ব্যাপারের জন্যে কে দায়ী তা কেউ বলতে পারে না। আমি বুঝতে পারি রাহুলের অমন মন খারাপের জন্যে এ বাড়ীর কাকুকে দায়ী করা যায় না। ছোট আপার বেরিয়ে

যাওয়ার জন্যেই বা কাকে দায়ী করবো! আর আনিস ভাইএর এই যে যন্ত্রণা, আর নিজেকে তিলে তিলে হত্যা—যা আমার বুকের ভেতরে তীব্র ভাবে বাজে তারও জন্যে এ বাড়ীর কারুকে দায়ী করা যায় না।

ক'দিন আগে মনে হয়েছিলো দোষ বাবার, দোষ আমার, দোষ আনিসের। এখন বুঝি সে সব আমার আবেগের মুহূর্তের ভাবনা। শত্রু রয়েছে অগোচরে, আমারও তাই। এ বাড়ীকে যে ধ্বংস করছে সে রয়েছে সব রকম সন্দেহের ওপরে। দূর থেকে নানান ছলে সে এগিয়ে এসে ভেতরে ভেতরে ভিতের ইঁট খসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। অথচ কেউ টের পাচ্ছে না। চারদিক থেকে কি একটা শক্তি ধীরে ধীরে তার প্রকাণ্ড থাবার মধ্যে চেপে ধরতে চাইছে। একদিন হয়তো দেখবো এতোবড় বাড়ীটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

শুনেছি বাবা জমিদারের ছেলে। তার বাবা বিলাস করে জমিদারী ফুঁকে দিয়েছেন। বাবা নেমেছিলেন ব্যবসায়। জমির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে—এখন বাবারও আর দাঁড়াবার জায়গা নেই।

আমাকে যে আরো কতো দেখতে হবে কে জানে। বুক ভরে শুধু আমার ভেতরটা হু হু করে। এতোবড় একটা বাড়ী ক'দিন পর ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, কিন্তু কেউ তাকিয়ে দেখবে না, কারুর কোন কষ্ট হবে না। ভেবে কী লাভ, কাকে বলি আমি সে কথা।

বাবার জন্যে আমার এতো কষ্ট হয় সময় সময়। এতো কান্না পায়।

হয়তো পেতো না কান্না। কিন্তু বাবাকে চিনতাম না। সেদিন চিনলাম। আর কষ্ট হলো আমার।

বাবা টাকা নিয়েছিলেন বরকত এলাহীর কাছ থেকে। লোকটাকে আমি দেখেছি। আমাদের বাড়ীতে লোকটা আসতো। সব সময় হাসি হাসি মুখ। সুন্দর দাড়ি রাখে ভদ্রলোক। দাড়ির আড়ালে দুটো ধূর্ত চোখ সর্বক্ষণ জ্বলছে। আর কী চোখ সে দুটো! মনে হয় মানুষের মনের ভেতরটা পর্যন্ত বোধহয় লোকটা দেখতে পায়।

বরকত সাহেব এলে চা খাওয়াতে হয়েছে। আমিই চা দিয়ে এসেছি নিজের হাতে। পান সেজে দিয়েছি।

দোকান ক্রোকের আগে, হাঁ ঠিক দু'দিন কি তিনদিন আগে লোকটা এসেছিলো এ বাড়ীতে। বাবাকে কি যেন অনেকক্ষণ ধরে বোঝাতে চাইছিলো। বাবা কেবলি গর্জে উঠছিলেন ঘরের ভেতরে। একটু পর আমি চা নিয়ে যাচ্ছিলাম ভদ্রলোকের জন্যে। দরজার কাছে গিয়েছি—এমন সময় বাবা ঘর থেকে বেরুলেন। দু'চোখের রঙ লাল। বাবার এমনিতে ব্লাডপ্রেসার। তার ওপর ভয়ানক রেগে উঠেছেন। আমার ভয় হলো, কি জানি কি হয়। বাবা আমাকে দেখেই ধমকে উঠলেন, কি চাস্ তুই ?

বললাম, চা নিয়ে যাচ্ছি।

তুই কেন, বাবা আরেকবার গর্জে উঠলেন, আর কেউ নেই বাড়ীতে ?

বাবার কথায় আমাকে ফিরে যেতে হলো। বাবা আমার নিজের বাবা নয়। কিন্তু তবু আমাকে কোনদিন বকেননি। বিরক্ত হলেও কোনদিন মুখ ফুটে কোন কথা বলেন নি। অথচ আজ আমাকেই এমন করে ধমকে উঠছেন। বরকত সাহেবকে চা দিয়ে আসতে পারলাম না। ওকে চা দিতে আমার একটুও ইচ্ছে করতো না। কিন্তু তবুও দিতে যেতে হতো। মা জোর করে পাঠাতো।

লোকটাকে আমি প্রথম থেকেই পছন্দ করতে পারিনি। টাকা-পয়সাওয়ালা লোককে আমার কেন জানি না ভালো লাগে না। কিন্তু আমার ভালোলাগা মন্দ লাগায় কার কি এসে যায়। বাবা ওর সাহায্যে এতোবড় ব্যবসা চালাচ্ছেন। সে জন্যে সংসার চলছে। অমন লোকের সমাদর না করলে চলবে কেন। তা যেমনই লোক হোক না সে। এ কথা আমাকে কেউ বলে দেয়নি। আমার নিজের থেকেই মনে হয়েছে এ কথা। আর আমি সে জন্যেই অমন সমাদরের চেষ্টা করেছি।

কিন্তু ....

কিন্তু ঘটনাও যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, একথা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম। সেদিন বাবা কোথাও বেরোননি। সারা সন্ধ্যা মাথায় পানি ঢেলে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। আর অনেক রাত পর্যন্ত আমি পাশের ঘরে বসে বাবার নিঃশ্বাসের শব্দ স্থির হয়ে শুনছিলাম। তারপর জানালার ওপার দিয়ে ঠাণ্ডা আকাশের বুকে তারার ঝাঁক দেখতে ইচ্ছে করছিলো। বতো বথা মনে পড়ছিলো। আমার ছেলেবেলা, আর সেই সময়ের বন্ধুদের। আর সেই সঙ্গে বাইরের দুনিয়ার সব কথা ভাবছিলাম এলোমেলো। এমন সময় মার গলা শুনলাম। বলছে, বেশ তো, বরকত এলাহীর কী আর এমন বয়স হয়েছে।

না, না! বাবা গজরাচ্ছেন তখনও। ওসব কথা তুমি মনেও এনো না। যায় যাবে আমার ব্যবসা, কিন্তু একটা জীবন নষ্ট করতে পারবো না আমি।

মা বোঝাতে চেস্টা করছেন, আহা জীবনটা যে নষ্ট হয়ে যাবে সেকথা কে বলেছে তোমাকে। এমনও হতে পারে সেখানেই ওর জীবনের সব সুখ আছে।

না, না, ওসব বাজে কথা বন্ধ করো তুমি।

মা রেগে উঠলে যেন। বললো, তার মানে তুমি চাও তোমার ব্যবসা চলে যাক আর আমার নাবালক ছেলেমেয়ে দুটো না খেয়ে মরুক? একটু পর আবার বললো, তুমি না রাজী থাকো, আমি রাজী হচ্ছি।

না, ওসব হয় না। বাবার স্থির জবাব, তুমি নিজের মেয়ের এমন সর্বনাশ করতে চাও কেমন করে।

কিন্তু বরকতকে সামলাবে কেমন করে।

সামলাবো কেমন করে! এখন দুটো পথ খোলা। হয় ওকে সন্তুষ্ট করা না হলে দোকান সম্পত্তি ওর হাতে তুলে দেওয়া। এখন দশ হাজার টাকা আমি কোথাও পাবো না যে ওর দেনা শোধ করবো। তবে একটা ষোল বছরের বাচ্চা মেয়েকে ওর হাতে তুলে দিতে পারবো না এটা ঠিক।

রক্ত এখনো তাঁর দেহে। মা যতোই বলুক না কেন, শুধু মা কেন, আমি এখানে থাকলে দাদু চাচা ওরাও এ-বিয়েতে রাজী হয়ে কিছু করতে পারবে না।

কিন্তু মা। আমারই মা'র মন এমন কেন? আমার জীবন তাঁর কাছে কি কিছুই না! পুতুল আর মম-এর কথা মা ভাবছে কিন্তু আমার কথা মা ভাবছে না কেন। মা'র জীবনের সুখ বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই কি আমার জন্ম হয়েছে!

আমার কেউ নেই। কেউ নেই আমার। না বাবা, না মা, না বোন—কেউ না। কার জন্যে তবে আমি বাঁচবো। কার জন্যে?

শুনেছি নিজের বিয়ের কথা শুনে মেয়েরা অবাক হ'য়ে যায়। আনন্দ আর পুলক, সাফল্য আর মাধুর্য বুকের ভেতরে সব অনুভব নাকি একসঙ্গে জেগে ওঠে। কিন্তু আমার যে শুধু ঘৃণা জাগছে। শুধুই ঘৃণা।

অথচ আমার জীবন তো আর সবার জীবনের মতোই হতে পারতো। কোন দিন হয়তো কাকে আমার ভালো লাগতো। আমার জন্যে সে হয়তো ভাবতো। সারাদিনের কাজ সেরে এলে আমার সঙ্গে দেখা করে যেতো। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুক ভরে উঠতো। ওকে আমি ভালোবাসতাম। তারপর একদিন সবাইকে জানিয়ে আমি ওর কাছে চলে যেতাম। কোন উৎসব হতো না। কোন আয়োজন থাকতো না। মনে থাকতো আয়োজন আর আনন্দে থাকতো উৎসবের সমারোহ।

হায়রে! মরণই তা'হলে আমার একমাত্র গতি। অথচ আমার বেঁচে থাকতে কতো ইচ্ছে করে।

ঘুম আসেনি আমার চোখে। কাঁদবো যে মন ভরে সে অবস্থাও ছিলো না মনের। আর কাঁদবোই বা কেন? দুঃখ কোথায় আমার। শুধু যে ঘৃণা। নিজেরই ওপর ঘৃণা। নিজের দুর্ভাগ্যের ওপর, নিজেরই সব ভালো লাগা মন্দ লাগার ওপর তীব্র ঘৃণা। ঘরের ভেতরটা তখন

অসহ্য লাগছিলো। বাইরে বেরিয়ে এলাম। তখন কৃষ্ণপক্ষের পাণ্ডুর জ্যোৎস্না ছেয়ে আছে সমস্তটা বাড়ী। বারান্দায় বসে বসে হাঁটুর ওপর দু'হাত জড়িয়ে তার ওপর মাথা রেখে চুপ করে বসেছিলাম। চাঁপা গাছের পাতায় পাতায় ঝিরিঝিরি জ্যোৎস্নার রেখা আমার শরীরের ওপর পড়ছিলো। আমার ভাবনা ছিলো না, না দুঃখ, না কান্না, না ক্ষোভ, না ঘৃণা—কোন অনুভব ছিলো না। শুধু একাকী। আর শূন্য একটা নিঃসঙ্গতা নিয়ে বসেছিলাম। কতোক্ষণ যে কে জানে।

এমন সময় মাথার ওপর যেন কেউ হাত রাখলো।

চমকে উঠলাম। কিন্তু মাথা তুললাম না। ভাবতে চেষ্টা করলাম, কে এলো এ সময়ে। মা, না বাবা, না রাহুল, না এই পাণ্ডুর জ্যোৎস্না পথ চিনে আনিস ভাই ফিরে এলো। অপেক্ষা করলাম তার ডাক শোনবার জন্যে। কিন্তু অনেকক্ষণ কথা বললো না সে।

মঞ্জু মা, থেমে থেমে বাবার কণ্ঠস্বর ডাকলো আমাকে।

যে নামে কোনদিন আমাকে ডাকেনি বাবা, সেই নামে আজ ডাকলেন। মাথা তুললাম আমি। দেখলাম, বাবা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। সহানুভূতি আর স্নেহ, করুণা আর বেদনা যেন শরীর ধরে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, ঘুম আসছিলো না, তাই।

তুই সব কথা শুনেছিস, না? বাবা আমার কথা শেষ না হতেই জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ, মাথা নাড়লাম আমি।

সে জন্যে ভাবিস না; হঠাৎ বাবা জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, আমি যতোক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ তোর সব দায়িত্ব আমার। তোর যা ভালো লাগবে না তা আমি কক্ষনো হতে দেবো না।

আমি চুপ। আমার বলবার মতো কোন কথা নেই। বাবাকে কেমন করে বলবো যে আমার জীবনের কষ্টের কথা ভাবছি না। ভাবছি তাঁর মা কেন আমার মা থাকলো না। ভাবছি, আমার বেঁচে

থেকে লাভ কী, কার জন্যে বাঁচবো আমি।" কিন্তু কেমন করে সেকথা বাবাকে বলি। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন তখন। অনেকক্ষণ। তারপর আবার বললেন, তুই বরং এখান থেকে কিছু দিনের জন্য চলে যা। থেকে আয় তোর দাদুর ওখানে। এ সব কষ্ট থেকে কিছু দিনের জন্যে রেহাই পাবি।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ পাণ্ডুর হয়ে সরে গিয়েছে অনেক পশ্চিমে। আমার বলবার সব কথা ফুরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। তবু বললাম, আমি ওসব কথা আর ভাববো না বাবা। আমার ভাগ্যে যা আছে তাইতো হবে।

খানিক পর বাবা বললেন, যা শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে। বাবার কণ্ঠে অপরিসীম স্নেহ।

বাবা'র পাশাপাশি হেঁটে আমার ঘরের বারান্দায় এলাম। আমার পিঠের ওপর বিশাল স্নেহের আশ্রয়ের মতো বাবার হাত। ঘরে এসে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। আর আমার মনের সব কান্না হারিয়ে গেলো সেই মুহূর্তে। পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করলো।

ইচ্ছে করলেই তো আর সব পারা যায় না। ইচ্ছে আর মন যে আলাদা। শুয়ে পড়েও ঘুম এলো না আমার। তখনও ভাবনা। ভাবনা আর বিস্ময়। মানুষকে বাইরে থেকে কে চিনতে পারে। বাবা আমার বিয়ের দায়িত্ব নিতে হবে বলে আমাকে এ বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন—আমার এই ধারণা ছিলো। কিন্তু কতো ভুল ধারণা আমার! আর যদি সে ধারণা ভুল না-ও ছিলো তবু সেই লোক কতো বদলে গেছেন। যে কোন দিন আমাকে নিজের করে নিতে পারবে না বলে আমার মনে হয়েছিলো—তাঁরই কাছে আমি সব চাইতে আপন হয়েছি। আনিস ভাই আর ছোট আপা, আমি আর রাহুল। পুতুল আর মম, আমরা সবাই যেন সমান তাঁর কাছে। আর এই মুহূর্তে মনে হলো, সব কিছুর গভীরে, অত্যন্ত নিগূঢ় গভীরে আমরা সবাই যেন এক হ'য়ে রয়েছি অন্ততঃ বাবার মনে।

বাবা'কে ভুল বুঝেছে সবাই। আমি যেমন ভুল বুঝেছিলাম, তেমনি ভুল বুঝেছে ছোট্ট আপা, তেমনি ভুল রাহুলের, হয়তো আনিস ভাইয়েরও। অ মাব সব চাইতে দুঃখ মা' বাবাকে চিনতে পারে নি। পারলে মা সুখী হতো।

সব চিন্তার শেষেও চিন্তা থাকে আমার। তাহলে বাবা এরপর কি করবে? অন্ধকারের ভেতরে চোখ মেলে আমি নিজেকেই যেন প্রশ্ন করি। তবে কি বাবা ধ্বংস হয়ে যাবে! না ব্যবসা ফেলে গ্রামে ফিরে চাষ-বাসে মন দেবে। না কে থাও চাকরির চেষ্টা দেখবে।

জীবিকাই যে জীবনের সব নয় তা তো বাবাকে দেখেই আমি বুঝতে পারি। তবু বাবাকে কিছু করতে হবে। অন্ততঃ তাঁর মনের জন্যেও। নইলে তাঁকে হারাবো আমরা। জমিদারের ছেলে ছিলেন। দু-হাতে টাকা খরচ করে ব্যবসায়ে নেমেছিলেন। আর ক্রমাগত ক্ষতিই হয়েছে তাঁর। কিন্তু কোথাও কোনদিন দমেন নি। পেছনের দিকে পা রাখেন নি। একমাত্র ভরসা তাঁর ইন্সিওরেন্সের টাকাটা। যেটা কোম্পানীর কাছে ধার চেয়েছেন। যদি না পান তাহলে কী যে হবে কে জানে। হে খোদা, বাবা যেন হেরে না যান। আমি প্রার্থনা করলাম মনে মনে। তারপর এক সময় আমি নিজের মনের থেকেও চুপ করে গিয়েছি। সব নিঃশব্দতা যেন হারিয়ে গেলো একেবারে। আমার ঘুম পেতে লাগলো। তখন পাণ্ডুর জ্যোৎস্না বাইরের উঠান থেকে মিলিয়ে গিয়েছে।

বাবা ক'দিন বাইরে বাইরে ঘুরলেন। খাওয়া দাওয়ার ঠিক নেই। সকালে বেরিয়ে একেবারে সন্ধ্যার দিকে আসেন। খোঁজ নিয়ে জানলাম। বাবা গ্রামের সম্পত্তি বিক্রি করে দেবেন। সে জন্যে ঘোরাঘুরি করছেন। বাবার মামাতো ভাই আকরাম চাচা ক'দিন ধরে আসা যাওয়া করছে। আসে বাবার খোঁজে। বাবা থাকেন না, মা'র

সঙ্গে ঘরে বসে গল্প করে। চল্লিশের মতো বয়স ভদ্রলোকের। শক্ত সমর্থ চেহারা। জাহাজে চাকরি করতো। কি একটা মামলায় জড়িয়ে পড়ে চাকরি গিয়েছে। ও অংশীদার হিসেবে বাবার সঙ্গে ব্যবসা করে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেখতে চেয়েছে। বাবা রাজী হন নি। বলেছিলেন, আগে ব্যবসা বুঝতে শেখো তারপরে নামবে।

বাবার এখনকার অসুবিধা দেখে আকবাম চাচা এখন নিজের ব্যবসা খুলে ফেলতে চাইছে। বাবাকে বলেছে, বরং আপনি দোকানটা বিক্রি করে দিন। ঐ অবস্থাতেই কিনে নি আমি। তারপর পাওনা-দাবাদের দেখে নেবো। বাবা কোন কথা বলেন নি। বাবা যে ওর কথার খুব বেশী গুরুত্ব দেন না এটা আমি লক্ষ্য করেছি। ওর কথায় কান না দিয়ে বাবা সম্পত্তি বিক্রির চেষ্টাই করতে লাগলেন।

এতো কাজ করতে হয় বাবাকে, কিন্তু মাকে দেখলাম না বাবার জন্যে এতটুকু চিন্তা করেন। লোকটা এলো কি এলো না, তার খাওয়া হলো কি হলো না সেদিকে যেন কোন খেয়াল নেই। হয় সাকিনা খালার সঙ্গে গল্প করছে। না হ'লে আকবাম চাচা ওর সঙ্গে আলাপ করছে।

এ দিকে বাবা বাসায় এসে গোসল সেরে খেয়ে নিয়ে, কোন বিশ্রাম না করেই বেরিয়ে যান। আর এ জন্যেই আমাকে সজাগ থাকতে হয়। বাবার গোসলের পানি তুলে রাখা, খাওয়ার ব্যবস্থা করা। খাওয়ার পর হাতে মশলাটি পর্যন্ত দিতে হয়। এবং যদি সিগ্রেট হাতে নিয়ে দেশলাইটা খুঁজে না পান তা'হলে দেশলাইটা পর্যন্ত হাতে এগিয়ে দিতে হয়।

বাবার বয়স হয়েছে, কিন্তু বাবা এই বয়সটাকে অগ্রাহ্য করতে চান। শুধু মাত্র মনের জোরে। নইলে এ রকম বয়সে বাবার মতো লোকের পক্ষে অত খাটুনি সম্ভব ছিলো না। মনের এই দৃঢ়তা আমি দেখতে পাই। কিন্তু তবু তো একটা দেহ আছে বাবার। আর সেই দেহে বয়স ক্লান্তি ছড়িয়ে রাখে আজকাল। আমি বুঝতে পারি কাজের পর বাবা

একটু বিশ্রাম আর শান্তি চান। আর সে জন্যেই আমি বাবার কাছা-কাছি না থেকে পারি না।

মাঝে মাঝে বাবা আজ কাল তাঁর কথা বলেন। খেতে খেতে অথবা কাজের পর বাসায় ফিরে ইজিচেয়ারে এসে বসেন যখন, তখন। আমি বাবাকে ব্যতাস করি আর শুনি।

আর বুঝতে পারি বাবার এখন আর কোন পথ নেই। জমিজমা বিক্রি করায় অসুবিধা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। অংশীদার বেরিয়েছে এখন সম্পত্তির। বিক্রি করলে আবার মামলায় জড়িয়ে পড়তে হবে। যদি ইন্সিওরেন্সের টাকাটা ধার না পান তা'হলে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের কোন পথ নেই।

এই সময় বড় খোকা যদি কাছে থাকতো! বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

সত্যি, আনিস ভাই যদি থাকতো এ সময়ে তা'হলে বাবার কতো সাহায্য হতো। বাবা একা আর কতো পারেন।

সব চাইতে আশ্চর্য লাগে মা'র কাণ্ড দেখে। এদিকে এতো ভয়ঙ্কর দাঁড়িয়ে গিয়েছে বাড়ীটার অবস্থা কিন্তু মা'র যেন ভ্রূক্ষেপ নেই সে দিকে। দিব্যি গল্প জমিয়ে আগের মতো দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। আর রাতের অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাবার ওপর রাগারাগি করছে।

ঘটনা আর ঘটনা। এতো ঘটনা ঘটতে পারে আমাদের চারপাশে। আমাদের বাড়ীর আর চারপাশের। ক'দিন আগে ছোট খালা মা'র কাছে তাঁর মেয়ে মীনার সঙ্গে আনিস ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাব আনেন ব্যাপারটা জানতাম না কেউ। আজই জানা গেলো। সকালে ছোট-খালা এসে কেঁদে ফেললো মা'র কাছে। কী ব্যাপার! না কাল রাত থেকে মীনা বাড়ীতে নেই।

মীনা মেয়েটা অমনই। বাইরে ও কথাবার্তা কম বলে। অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয়েছে। খুব চাপা মনে হয় ওকে। কিন্তু ওর শোবার ঘরময় শুধু সিনেমার মেয়েদের ছবি। ওর চুল বাঁধা, শাড়ি পরা, চোখের কাজল দেওয়া, গালে মুখে রঙ মাখা সব সিনেমার মেয়েদের

অনুকরণ করে। এক একদিন কি বিচ্ছিরি পোষাক পরে এ বাড়ীতে এসেছে। আমার এমন অস্বস্তি লাগতো ওর দিকে তাকিয়ে। আমারও মাথা লজ্জায় নিচু হয়ে এসেছে। ও নিজে কিন্তু নির্বিকার। বলেছে গ্ল্যামারই নাকি মেয়েদের সব। ছেলেরা গ্ল্যামার ছাড়া আর কিছু বোঝে না। আমি কথা শুনে মনে মনে নমস্কার জানিয়েছি—থাক বাপু তুই গ্ল্যামার নিয়ে দূরে। আমাদেব ওসবে দরকার নেই।

মীনা একবার, সেই দু'বছর আগে যখন ও ক্লাশ নাইনে পড়তো, তখন সিনেমা হলের তুই দারোয়ানের সঙ্গে পালিয়েছিলো। ইচ্ছে ছিলো নাকি ও সিনেমা করবে। ধরা পড়ে পরে ফিরে এসেছে।

সেই মীনার বাড়ি থেকে পালানোর খবর শুনে চমকে উঠলাম। ছোট খালা তখনও বলছেন, ও রাক্ষসী আমাকে না খেয়ে স্থির হবে না। ভেবেছিলাম তোর কাছে দিয়ে যাবো কিন্তু শেষটা ও কি না···পাশের বাড়ীর বখাটে ছোঁড়া আফজালেব সঙ্গে····।

আমার খুব হাসি পাচ্ছিলো তখন। আনিস ভাইকে খুব চিনেছে ছোট খালা। ও যেন এই মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছে একেবারে।

আরেক ঘটনা। ছোট আপা চিঠি লিখেছে বাড়ীতে। ওর বিয়ে মাসখানেক পরই। বিয়ের পব ও বাড়ীতে আসবে। ঢাকায় ও নার্সি এর ট্রেনিং নিচ্ছে।

আর সব চাইতে বড় ঘটনা, ভারী মজার। আমারই স্কুলের বন্ধু রঞ্জু আর নাসিমা কলেজে ঢুকেই নতুন করে প্রেমে পড়েছে। স্কুলে পড়তে পড়তেই ওরা যে কতোবার করে প্রেমে পড়লো খোদাই জানে। ওদের অমন ছ্যাবলামো আমার একটুও ভালো লাগে না। কিন্তু তবু ওরাই তো আমার বন্ধু। ওদেরই সঙ্গে আমি দু' একটা কথা বলতে পারি মন খুলে। আমি জানি ওদের সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকমের কথা বলে কিন্তু ওরাই আসে আমার কাছে। আর কেউ তো আসেনি কোনদিন। আমি ইস্কুল থেকেই দেখে আসছি।

ইস্কুল জীবন আমার মোটে কয়েকটা মাস। কয়েকটা মাস, তবু একেবারে কম সময় নয়। কিন্তু দেখলাম স্কুলে আমার সমান বয়সী মেয়েরা আমাকে এড়িয়ে চলছে। দূর থেকে লক্ষ্য করে দেখেছি ওরা কয়েকজন মিলে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে আমার সম্বন্ধে আলোচনা করছে। আমাকে নিয়ে কয়েকজন ক'দিন বেশ হাসাহাসি করলো। ওদের সবার সঙ্গেই আমার আলাপ হয়েছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখেছি ওরা আমাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছে। যেন আমি মস্ত একটা পাপ করেছি। আমাদের পারিবারিক জটিল সম্পর্কটা যেন অস্বাভাবিক একটা কিছু। আর সেই অস্বাভাবিকতা আমি নিজে।

সেই থেকে আমাকেও এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে হয়েছে ওদের। এবং একাকী থাকতে চেষ্টা করেছি। সেই সময় এসেছে নাসিমা আর রঞ্জু। আর উঁচু ক্লাশের মেয়ে তাজিনা আসতো কাছাকাছি। আমি ইস্কুল ছাড়লাম। ওদের কারুর সঙ্গে আমার দেখা হয় না। কিন্তু আসে নাসিমা আর রঞ্জু। প্রায়ই আসে ওরা, আর চারপাশের গল্প শোনায়। সবচাইতে আশ্চর্য লাগলো সত্যি ওরা ভালোবাসছে। এতোকাল ওরা প্রেমের গল্প করতো। চিঠি লেখালেখি করতো ছেলেদের সঙ্গে কিন্তু তখন যেন দেখতাম ওরা ভারি মজা পেতো। চিঠি লেখা লেখা খেলা, প্রেম প্রেম খেলা বেশ জমে উঠতো যখন, তখন একদিন হঠাৎ খেলার পাট সাঙ্গ করে অন্য কিছুতে ঝুঁকতো। সেই রঞ্জু, সেই নাসিমাকে যখন দেখলাম প্রেমে পড়তে তখন আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না।

রঞ্জু এক অদ্ভুত মেয়ে। ওদের দু'জনের মধ্যে ও সুন্দরী. পাড়ার মেয়েদের মধ্যে সব চাইতে বেশি বুদ্ধি রাখে, সবচেয়ে ওর গুণ বেশি আছে, কিন্তু ও নিজে একথা কোনদিন স্বীকার করে না। নিজের সম্বন্ধে ওর ধারণা সাধারণ। নিজে জানে ও সাধারণ। কিন্তু একটি মাত্র দুর্বলতা আছে ওর। ওর ধারণা ছেলেরা ওর সঙ্গে পরিচিত হলেই

প্রেমে পড়ে যায়। আমার একেক সময় এতো হাসি পায়। ই আশেপাশে সংখ্যা গুণতে গুণতে যে ওকে এ নিয়ে আর কোন কথা বলো। কিম্বা না। অদ্ভুত মানসিকতা মেয়েটার। ক ভেঙে

আর নাসিমা। এও এক আশ্চর্য মেয়ে। ছেলেদের দু'চোক্ষা দেখতে পারে না। বলে, ও জাতটাই শয়তান, একবার প্রশ্রয় দিয়েছিস কি মরেছিস। সব সময় ছেলেদের ঘেন্না করে। ইস্কুলে পড়বার সময় ছেলেদের লোভ দেখিয়ে কায়দায় ফেলে পাড়ার ছেলেদের দিয়ে মার দেয়াতো। আবার কি মজা, সেই মার খাওয়া ছেলেকেই আবার ও মাসের পর মাস ধরে চিঠি লিখতো। সেই মেয়ে নাসিমা প্রেম করছে, আশ্চর্য নয়!

ওদের কি বিচিত্র সব কথা। কী যে লাভ অমন কথা বলে, ওরাই জানে। আমার কতো বার বিরক্ত লেগেছে, নিষেধ করেছি ওসব কথা বলতে। কিন্তু ওছাড়া ওদের আর কোন কথা নেই। আমাকে শুনতেই হয় অগত্যা।

আজ মঞ্জু আহসানের কথা তুললো। বললো, এবার আর ছেলে মানুষী নয়। বিয়ে তো এক সময় করতেই হবে। তুই তোর আনিস ভাইকে জানাস কথাটা। ওর আব্বা আনিস ভাইকে খুব ভালোবাসেন মাথা নেড়ে জানালাম, আচ্ছা বলে দেবো।

নাসিমা সারাক্ষণ চুপ করে ছিলো। কিছু যেন ভাবছিলো। রঞ্জু এক সময় আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে, ওকে জীবনে না পেলে আমি সুখী হতে পারবো না মঞ্জু।

আমি ওদের অবস্থা দেখে দুঃখ পেলাম। মেয়ে দুটো মিছিমিছি কষ্ট পাবে। অথচ এসব ব্যাপার আমার মতো স্বাভাবিক ভাবে নিলেই পারতো।

সেদিন রঞ্জু আর নাসিমার সঙ্গে আমাদের পুকুর ঘাটে বসে অনেক গল্প করলাম। প্রজাপতি উড়ছিলো ঝাঁক ঝাঁক। সামনের দিকে বুনো ফুলের কাঁটা গাছ। অজস্র ফুল ছিলো সে গাছগুলোতে। রোদ্দুরে

না দুপুরটা। প্রকাণ্ড আকাশ আর হাল্কা হাল্কা মেঘের

...ম্ন বললো, যখন প্রথম দেখে ও আহসানকে তখন নাকি ওর বিরক্তি লেগে ছিলো। ঠিক বিরক্তি নয়। ও শুধরে বললো, আমার ভেতরে কেমন যেন ভয় ভয় করছিলো।

অথচ আসলে ভয়ের কিছুই ছিলো না। বড়লোকের ছেলে, খুব ভদ্র। কোনদিন দেখিনি বা শুনিনি ও কারুকে খারাপ কথা বলেছে, বা খারাপ ব্যবহার করেছে। কিন্তু যখন ও কথা বলে, মনে হয় সমস্ত ঘরময় অনেক লোক একসঙ্গে একই কথা বলছে। আর যখন ও হাসে, মনে হয়, ঘরের দেয়াল পর্যন্ত কাঁপছে। সে দিন মনে হয়েছিলো ও একটা ব্রুট।

আরও মজা কি জানিস ? আমাদের বাসায় একদিনও আসেনি। আসতো নাসিমাদের বাসায়। পরে জানলাম ওদের সঙ্গে নাকি নাসিমাদের কি একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। একদিন নাসিমার খোঁজ করতে গিয়েছি, ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। অনেকক্ষণ ঘরে পায়চারি করে যখন ও বললো, আমি যাই এখন। আমাকে বলতে হলো, একটু বসুন, নাসিমা এখুনি আসবে। আমি জানতাম নাসিমার ওপর ওর একটু দুবলতা আছে।

আমাকে অবাক করে ও বিস্মিত হলো, নাসিমা আসবে ? নাসিমার সঙ্গে তো দেখা হলোই। একটু থেমে আমার চোখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বললো, নাসিমার জন্যে অপেক্ষা করবো কেন ? তুমি ভুল করছো বোধ হয়।

আমি ভুল করছি। 'কথাটা ভাবালো আমাকে। কেন তবে ও রোজ বিকেলে নাসিমাদের বাড়িতে আসে। কেন ও অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে!

জানলাম পরে। এ জানা কথা দিয়ে জানা নয়। দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে একটু একটু করে জানা। মাঝে মাঝে বেশ কিছুদিন ধরে

দেখা হয় না, তবু মনে হয় ও যেন সব সময় আমারই আশেপাশে রয়েছে। শান্ত ঘরের মধ্যে এইমাত্র একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিলো। কিম্বা হয়তো এক্ষুনি প্রচণ্ড হেসে শান্ত ঘরের চুপচাপ নিঃশব্দতাকে ভেঙে খান-খান করে দেয়ালগুলোকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেবে। শুধু অপেক্ষা করে থাকা। অপেক্ষা করে থাকা সারা মন নিয়ে। ওর জন্য কেবলি প্রার্থনা করা। আমার যেন চাইবার কিছুই নেই ওর কাছে। দেবারও নেই কিছু। শুধু যন্ত্রণা। তারপর খালি মনে মনে দেখতে ইচ্ছে করেছে আমার। একেক সময় মনে হতো ও যদি রোজ আসতো আমার কাছে।

কিন্তু মজা দেখ, কাউকে জানাতে পারি না, আমার মনের এই অবস্থাটা। এমন কি ওকেও না। ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোনদিন আমার সব কথা বলতে পারবো কি না সে-ই এখন আমার সব চাইতে বড় ভয়। আমার বড় বাড় বেড়েছিলো মঞ্জু। ভেবেছিলাম শুধু আমিই একা মেয়ে, আর ছেলেরা সবাই আমার কাছাকাছি বসে ভিড় জমাবে। আমারই শুধু দাম আছে। আর কারুর নেই। এখন সেই আমারই ওর পায়ে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

আমি আবেগ আর ভালোবাসার ছবি দেখছিলাম ওর মুখে। মেয়েটাকে তখন আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিলো। এতো সুন্দর কোনোদিন দেখিনি। ভালোবাসার আলো মুখের উপর তখন আভার মতো ফুটে উঠেছে।

নাসিমা একমনে শুনছিলো। ওরও কথা নেই। একটু বোধ হয় অন্যমনস্কও ছিলো। মঞ্জুর কথা শেষ হলে বললো, খালা আম্মার কাছে না হয় আমিই কথাটা তুলবো।

থাম তুই! আমি ধমকে উঠলাম ওকে। তোর নিজেরটা সামলা আগে তুই, তার পরে অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে যাস।

নাসিমা জামিলকে দেখেছিলো পথে। ঢাকা থেকে রংপুরে ফেরার পথে। দু' একদিন দেখা হয়েছে তারপর। জামিল নাসিমাদের প্রতিবেশী

কবির সাহেবের আত্মীয়। একদিন রাস্তায় পাশাপাশি হেঁটেছে দু'জনে। রাস্তার মোড়ে ছাড়াছাড়ি হবা'র পর দুঃসাহসী জামিল হঠাৎ প্রশ্ন করেছে, কাল দেখা হবে?

নাসিমা প্রথমটা জবাব দিতে পারেনি। তারপর জামিলকে ওর কথার জবাবের জন্যে অপেক্ষা করতে দেখে মৃদু কণ্ঠে বলেছে, হ্যাঁ হবে। কাল সকালে, খুব ভোরে।

জামিল তক্ষুনি চলে যায় নি। আবার প্রশ্ন করেছে, আমি যদি চলে যাই, ভাববে তুমি?

হ্যাঁ. এবার অনেক জড়তা কাটিয়ে মুখোমুখি তাকিয়ে জবাব দিয়েছে নাসিমা।

কেন? পাল্টা প্রশ্ন করেছে জামিল।

জানি না। নাসিমার তখন লজ্জা করছিলো।

জানো না? প্রশ্নের পর প্রশ্ন এসেছে স্রোতের মতো।

না আমার লজ্জা করেনি তখন, নাসিমা বললো আমাদের কাছে। ইচ্ছে করছিলো, নিজেকে ওর হাতে তুলে দি। ও যা ইচ্ছে করুক।

এই। ওকে বাধা দিলাম, নোংরামি করবি না।

বাঃ আমার জীবনের ভালোলাগার কথা নোংরা লাগছে তোমার কাছে?

লাগবে না, ওর হাতে নিজেকে তুলে দেয়ার আর কি মানে হয়?

আমার কি মনে হচ্ছিলো বলবো না? আর....

'আর কি? কৌতূহলী হলো রঞ্জু।

আর নিজেকে তুলে দেয়ার যে কি আনন্দ, কি শান্তি....

এই নাসিমা ফের?

বেশ বলবো না। নাসিমা গম্ভীর হলো। এটা লোকে দোষের ব্যাপার মনে করে। কিন্তু আমি তো জানি যারা এ ব্যাপারে বড় কথা বলে তাদের শেষ অবস্থায় কি অবস্থা হয়েছিলো। অল্প বয়সে রাণী

দিদিমনি কতজনকে ফিরিয়ে দিয়েছিলো। শেষটা শেষ বয়সে আমাদের বাড়ির পেছনের রাস্তা দিয়ে জ্যোৎস্নারাতে কতো দিন দেখেছি রাণী দিদিমনিকে পর পর বি-এ ফেল করা আশরাফের ঘরে যেতে। আর বাজিয়া খানকে তো তোরা দেখিস নি, অমন বিকৃত হওয়ার চেয়ে মেয়েদের মরে যাওয়া ভালো।

আমরা অবাক। ভয়ঙ্কর অথচ কৌতূহলের একটা দরজা খুলে যাচ্ছে যেন আমাদের চোখের সামনে। বুঝছি এ সব শোনা উচিত নয় আমার। কিন্তু ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে এখন। না শুনে পারছি না।

বাজিয়া খান কলেজে চাকরী করতো ঢাকায়। থাকতো একটা হোষ্টেলে ছাত্রীদের সুপার হয়ে। সেখানে একটা মেয়েকে নিয়ে কি কেলেঙ্কারীটাই না করতো। এদিকে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের মেলামেশা একদম দেখতে পারতো না।

অথচ মজা দেখ, দিনের পর দিন দেখেছি ওর চেহারা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। আর মেজাজও তিরিক্ষি হয়ে উঠছে।

অথচ রাণী দিদিমনি কেমন সুন্দর হয়েছিলো দেখতে। কেমন মিষ্টি ব্যবহার হয়েছিলো তার। সেই জন্যেই তো। গল্প শুনিয়ে নাসিমা মন্তব্য করলে।

সে জন্যে কি?

সেই জন্যেই তো আমি—

ও আর বলতে পারলে না। বুঝলাম কোন সিদ্ধান্তের কথা বলতে চায় মেয়েটা। ওর কথা শুনে নিঃশব্দে পাথরের মতো বসে রইলাম। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে সেই কখন। বঞ্জু মুখ নীচু করে বসে থাকলো। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কেন একথা বললো নাসিমা, কেন বললো? কেন?

আমি জানি না কি আছে এই রক্ত আর মাংসের গভীরতর ভেতরে। কোন ধ্বনি, আর কোন সুর নিয়ত মোহিনী গান শোনায়। জানি না

কোন নিষ্ঠুর শত্রু রয়েছে আমারই ভেতরে যে আমাকে বার বার আনিসের কাছে ঠেলে দিতে চেয়েছে। যাকে আমি চিনতে পারি নি তখন স্পষ্ট করে। ওকে শ সন করি এখন। কিন্তু জানি না কখন আমাকে সে অস্বীকার করে বসবে। ওর আনন্দে যে আমি উল্লসিত হবো এমন কথা তো কেউ বলে নি আমাকে। শুধু যে কান্না। এই শরীর শুধু যে কাঁদিয়েছে আমাকে, তাতো ভুলতে পারি না কখনো। যতো যন্ত্রণা, সবতো এই শরীরটা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। এই বুক এই কাঁধ, মসৃণ চামড়ায় ঢ কা সুগোল বাহুমূল। কেন আমাকে সব সময় সন্ত্রস্ত থাকতে হবে। আর শরীরটা বেড়ে ওঠার সংগে সংগে লোভ আর লোভ। আমার চারপাশে শুধু ক্লেদাক্ত, পিচ্ছিল, রোমশ লোভ থিক্‌থিক্ করছে। সেই লোভ আর লালসার ওপরে আমি একেক সময় কোন মানুষের মুখ দেখতে পাই না।

তবে কি আমি একাকী থাকবো চিরকাল! চিরকাল ধরে একাকী।

কিন্তু আমি যে বাঁচতে চাই। আমারো যে প্রাণ ভরে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। আর ভালো না বাসলে বাঁচবো কেমন করে!

সব কিছুর অন্তরায় হ'য়ে রইলো আমারই এই শরীর। হায়রে! কবিগুরুর চিত্রাঙ্গদার অবস্থা হলো আমার। এই শরীরই আমার ভালোবাসার শুভ্র স্রোতকে ঠেকিয়ে রাখবে, আবিল করে ফেলবে। ভয় হয়, কোনদিন হয়তো আমি ভালোবাসার সেই উজ্জ্বল স্রোতকে ছুঁতে পারবো না। রঞ্জুই কি পারবে! কিম্বা নাসিমা?

নিজেকে প্রশ্ন করে আর বুঝতে পারি আমারই মন বলছে, পারবে, পারবে। সবাই পারে ভালোবাসার স্রোতকে ছুঁয়ে যেতে। ওদের কাছে যে সহজ হয়ে রয়েছে সব কিছু। সহজ ভাবে গেলেই যেন পাওয়া যাবে সেই স্রোতকে। রঞ্জু সহজ হবে, সহজ হবে নাসিমা আর এক সময় ওরা ভালোবাসতে পারবে।

সত্যি, কি আশ্চর্য! কত ঘটনা চারপাশে কী ভাবে ঘটে যাচ্ছে।

আর দেখছি, সব কিছুর অন্তরাল দিয়ে অণু পরমাণুতে পরিবর্তন আসছে। ধীর, অস্ফুট ভাবে, তবু আসছে। জানি না, আমিও বদলে যাচ্ছি কি না।

এ বাড়ীতে আসার পর কতোদিন হয়ে গেলো। কতো বদলেছি আমি। নাসিমা রঞ্জুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো, চিনলাম মীনাকে, তাজিনাকে। নিজের চোখে দেখলাম সবার মন কি ভাবে বদলে যাচ্ছে এক এক করে। শুধু আমার। আমারই মনের ভেতরে যন্ত্রণা। শুধু যন্ত্রণা।

রঞ্জু আর নাসিমা সে দিন গল্প করে সেই যে গেলো আর এলো না কয়েকদিন। ওদের সময় কোথায়! নিজেরই মন নিয়ে ওরা যে মগ্ন হয়ে রয়েছে। ওদের কথা মনে পড়লে ভাবি, রঞ্জুকে ছাড়লে আহসান তার সব মূল্য হারাবে, জামিলকে ছাড়া নাসিমা জীবনে সুন্দর হয়ে ফুটে উঠতে পারবে না। ওদের আলাপ হওয়াটাই যেন খুব স্বাভাবিক। পরস্পরকে ভালোবাসাটা যেন অবশ্যম্ভাবী ছিলো ওদের পক্ষে। এর চাইতে ভালো কিছু আর হতে পারতো না। কিন্তু সন্দেহ আর সংশয় থেকে কে আর কবে মুক্তি পেয়েছে? আমি কেবলই বলতে চেয়েছি, ওরা নিশ্চয়ই সুখী হবে। সারা জীবন ধরে ওরা বেঁচে থাকতে পারবে পরস্পরকে ভালোবেসে!

কিন্তু সেই সন্দেহ, সেই সংশয় তবু থেকেই যায়। সব সাধনার অন্তরাল থেকে যেন গম্ভীর আর প্রবল স্বর শুনতে পাই। মনে হয় একটা শূন্যলোকের ওপরে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ধ্বনি বেজে উঠছে। ধূমান্বিত শূন্যতার গভীর থেকে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই আমি। মনে হয় কেবলই যেন কেউ না কেউ বলছে। বুঝতে পারি এ সব আমার আজেবাজে কল্পনা! আমার নৈরাশ্যের ভেতর থেকে জন্ম নিয়েছে। আর সে জন্যেই শাসন করি নিজেকে। কেন আমার মনে এ ধরনের হতাশা আসে? তবে কি এখানেও রয়েছে আমার ভেতরকার সেই শত্রু। যে আমার বন্ধুর সুখ দেখে ঈর্ষায় জ্বলছে। আর সে-ই টেনে

নামাচ্ছে অন্ধকার অতল গহ্বরে। না, আর ভাববো না এসব। । বিধাতা, রঞ্জু যেন সুখী হয়, নাসিমা যেন সুখী হয়।

বাবা ধাক্কাটা সামলে উঠলেন। ইন্‌সিওরেন্সের টাকাটা পাওয়া গেলো। বাবার সে কি আনন্দ সেদিন। যখন শুনলাম, আমার মন আনন্দে ভরে উঠলো। এখন ভাগ্যকে জিতে নেবার আনন্দ। বাবার শুকনো হাসি দেখলাম আর নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচলাম।

দোকান খুললো আবার আমাদের। কিন্তু কী যেন চৌধুরী বাড়ীর ভেতরে ভেতরে ভেঙে গিয়েছে, তা আর জোড়া লাগবে না। বেনুদা আসছেই। আকরাম চাচা আসছেই। আকরাম চাচাকে দেখি আর আমার গা জ্বালা করে ওঠে। কেউ বলে না আমাকে। তবু বুঝতে পারি, লোকটা কী যেন ধ্বংস নিয়ে আসচে।

বাবা দোকান নিয়ে ব্যস্ত। আগের স্বাভাবিকতায় অনেক ফিরে গিয়েছি। কিন্তু তবু যেন সেই স্বাভাবিকতা ফিরে পাচ্ছে না কেউ। রাহুল কোথায় কোথায় যে ঘুরে বেড়ায় কিছু বলে না। আর আমি শুধু দেখছি। কখনো আনন্দে, কখনো ভয়ে আমি একাকার হয়ে যাচ্ছি।

এখন স্বস্তি পেয়েছি। বাবা আবার স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছেন, এই যেন এক গভীর স্বস্তি আমার। কিন্তু তবু যেন না না কিছু একটা দেখতে পাচ্ছেন না! দেখতে পাচ্ছি না আমিও। তবু যেন বুঝছি কিছু একটা ঘটবে।

এই সন্দেহ আর সংশয় কখনো নিশ্চিন্ত হতে দেয় না আমাকে। তবুত থেকে আত্মমুক্তি পেয়েছি এ জন্যে বিধাতার কাছে বারংবার মাথা নিচু করেছি আমি।

ছোট আপার চিঠি পাওয়া গেল আজ। খুব দুঃখ করে চিঠি লিখেছে। আর সে চিঠি আমাকেই লেখা। অনেক কথার শেষে লিখেছে, মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই মঞ্জু। বাড়ীতে আমি ফিরতে

পারবো কি না জানি না। ফিরলেও কোন মুখে ফিরবো! তবু হয়তো আমাকে ফিরেই যেতে হবে। রাহুল, মম, পুতুল ওদের জন্যে মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে যায়। যদি এ মাসের মধ্যে ফিরতে না পারি তা'হলে বুঝবি তোর ছোট আপা মরে গেছে। আমি কখনো মন ঠিক করতে পারছি না, কি করবো। আমার এ চিঠির কথা কারুকে বলবি না। বললেও আমার এই দুঃখের কথা জানাস না। আমার এতো একাকী লাগে একেক সময়।

আরো অনেক কথা ছিলো কিন্তু সে সব গতানুগতিক মনে হয়েছে আমার কাছে। খুব সাধারণ আর গতানুগতিক। শুধু ওই ক'টি লাইন পড়েছি বারবার। আর ছোট আপার চশমার কাঁচ আর শান্ত মুখ বারবার মনের মধ্যে ভেসে উঠছে। ছোট আপার জীবনের কান্না জমে রয়েছে লাইন ক'টির ভেতর। না, কারুকে বলি নি। এক বলতে পারতাম বাবাকে। বাবা ছাড়া ছোট আপার কথা আর কেউ বুঝবে না। কিন্তু বাবাকেই বা কেমন করে জানাবো। কতো দুশ্চিন্তার পর এই তো সেদিন একটু স্বস্তি পেয়েছেন। এখন এই চিঠি পড়লে আবার চিন্তা করতে আরম্ভ করবেন। না, এ চিঠি বাবাকে দেখাতে পারবো না।

রাহুলকে পড়তে দিতে ইচ্ছে করছিলো—

কিন্তু ছোট আপার নিষেধের কথা মনে করে তাও পারি না।

আমাকে পিক্‌নিকে যেতে হয়েছিলো সে দিন। বেনুদা ক'দিন ধরেই মা'কেই বলছিলো, বাবাকে বলছিলো। বাবা রাজী হন নি। বলেছেন, তোমরা যাও, আমার অনেক কাজ। মা রাজী ছিলো আগের থেকেই, কথা ছিলো বেনুদাদের বাসায় যাবে।

বেনুদা, ভাবী, মা, ঝুনু আর মুন্না—এরা সবাই যাবে। আর সেই সঙ্গে আমরা যদি যাই তা'হলে ভাল হয়। কথা ছিল বাড়ী শুদ্ধ যাওয়ার। বাবা গেলেন না। রাহুল রাজী হলো না যেতে। আমারও ইচ্ছে ছিলো না যাই। কিন্তু রাহুল যখন গেল না তখন আমার না গিয়ে উপায়

রইলো না। রাহুল আর আমি না গিয়ে বাড়িতে থাকলে মা কুৎসার অন্ত রাখবে না। মার চোখ বড় ভয় করি আমি। হ্যাঁ বড় ভয় আমার। রাহুলকে এক সময় ডেকে বললাম, তুই যা রাহুল। আমি তাহলে না গিয়ে বাঁচি।

রাহুল হাসলে আমার কথায়। আমি গেলেও কি তোকে ছেড়ে দেবে? তোকে নিয়ে যাবেই।

গেলাম। সারাদিন মীর নগরের প্রাচীন পুকুরের পাড়ে বসে থাকলাম। বেনুদা রেকর্ড বাজালো। সব প্রেমের গান। আমি সারা দুপুর কথা বললাম না কারো সঙ্গে। বলতে ইচ্ছে করছিলো না।

বেনুদা একবার কাছে এসে বললো, এসো একটু বেড়িয়ে আসা যাক আম-বাগানের দিক্ থেকে।

মাথা নাড়লাম আমি। না আমার ভালো লাগছে না। বরং আর কাউকে নিয়ে যান।

ঐ পর্যন্ত। বেনুদা নিষ্প্রভ হয়ে গেলো আমার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই। তারপর সারাক্ষণ ওর নিরুদ্যম হতাশ চেহারা দেখলাম। কিছু বললো না আমাকে। বুঝলাম ও খুব হতাশ হয়েছে। কিন্তু আমি কী করতে পারি তার জন্যে?

মা এসে ধমকে উঠলো। কেন, একটু নড়ে-চড়ে বেড়াতে পারিস না? ছেলেমানুষ ছেলেমানুষের মতো থাকবে। ছেলেমানুষের বুড়োমি দেখলে আমার গা জ্বালা করে।

তখনও আমি উঠলাম না। সন্ধ্যের পর সবাই ফিরে এলাম। বাড়ীতে এসে মা ডেকে বললো, বেনুর সঙ্গে তুই কথা বলিস না কেন? তোর নিজের খালাতো ভাই, অতো স্নেহ করে তোকে তবু কেন যে রেগে আছিস ওর ওপর বুঝতে পারি না। একটু মেলামেশা করা ভালো, নইলে লোকে কি মনে করবে?

মা'র এই কথা আমাকে সারাদিনকার এই হৈ-চৈ ব্যাপারটার একটি

পরিষ্কার অর্থ বার করে নিয়েছে। আমি বেনুদার সঙ্গে মেলামেশা করি মা'র একান্ত ইচ্ছা।

কিন্তু আমি পারি না যে। মার যেটা ভালো লাগে, আমার যে সেটা ভালো লাগে না। যদি এ-বাড়ি ছেড়ে যেতে পারতাম! গতকাল চিঠি পেয়েছি চাচার, ক'দিন পরই আসছেন আমাকে নিয়ে যেতে। চাচা এলে বেঁচে যাই আমি।

আজ আমার কেমন দিন কাটলো, কাকে বোঝাই সে কথা। যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা। মানুষের মনে যে কী করে এতো যন্ত্রণার জন্ম হতে পারে! আমি যেন নিজেরই শত্রু হয়ে পড়েছি। নিজেকেই হত্যা করছি তিল তিল করে।

তখন সকাল, এক রকম ভোরই বলা যেতে পারে। এ-বাড়ীর কেউই ওঠেনি তখনও। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। সারারাত গেছে গুমসানো গরম। ঠাণ্ডা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে শরীর জুড়িয়ে গেলো আমার। বাইরের ঘরের দরজা খোলা। বাইরের বারান্দায় রোজ সকালে দাঁড়াই আমি। ঘরের ডানদিক দিয়ে বারান্দায় যেতে হয়। জানালার পাশ দিয়ে যাবার সময় চমকে উঠলাম। ঘরে এ কে শুয়ে! দেখলাম আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো আমাকে। আনিস ভাই শুয়ে রয়েছে শক্ত তক্তপোষের ওপর। নোঙরা জামা-কাপড়, না-কামানো মুখ। ক্লান্তিতে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। নিঃশ্বাসের মৃদু মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে আমার মন ভরে উঠলো। নড়লাম না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখলাম। আনিস ভাই সুন্দর, কিন্তু এত সুন্দর ওকে কোনদিন মনে হয়নি। ক্লান্তিতে কি সুন্দর ছবির মত ঘুমিয়ে রয়েছে। নিমীলিত দু'টি চোখের ভেতরে যেন মধুর স্বপ্ন মিশে রয়েছে, আর সেই সঙ্গে নির্ভরতা। বহুদিন পর যেন এমন শান্তিতে ঘুমোচ্ছে ও।

কোথায় ছিলো এতদিন কে জানে। ওর দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ওর শুকনো চুলে হাত রাখতে ইচ্ছা করল আমার। সত্যি, ভারী সুন্দর চুল ছিলো ওর। সেই চুলে কতোকাল তেল পড়েনি, কতোদিন আচড়ানো হয়নি। নরম শুকনো চুলে আমার হাত ডুবে গেলো। তখন আমি ওর পাশে চৌকির ওপর এক হাত ভর করে দাঁড়িয়ে। একটু পর ও চোখ খুললো। আমাকে দেখে হাসলো। হাত ধরলো আমার। আমি কাঁপছিলাম তখন। কেন যে, নিজেই জানি না। মনে হচ্ছিলো আনন্দে ভেঙ্গে পড়বো। পাশে বসতে বললো। তারপর বললো, ফিরে এলাম, ভাল ছিলে তোমরা ?

এ যেন আনিস নয়, অন্য কেউ। কিন্তু তবু যেন একে আমি চিনি, বহুকাল ধরে চিনি। ওর কথার পর আর কোন কথা খুঁজে পেলাম না যে বলবো। সেই নিঃশব্দ সকালের আলোয় ভ'রে দে'য়া ঘরের মাঝখানে ওর মৃদু, ভরাট গলায় কুশল প্রশ্ন, কেমন ছিলে, এ-কথার উত্তরে কি আর কিছু বলা যায়! বললেই কি অমন সব কথা বলা হবে ? অত সুন্দর হবে।

আমি চুপ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। এক সময় ও বালিশ থেকে মাথা তুলে আমার কোলের ওপর মাথা রেখে চোখ বুজলো। আর আমি ওর মাথার চুলে হাত রাখলাম। বুকের ভেতরে তখন একটা অসহ্য কান্না মাথা কুটে মরছে। কান্নার ভারে যেন ভেঙ্গে পড়বো। তখন চোখ বুঁজে বলছে, আর পারি না আমি। আমি যে কী করবো!

আমার সারা বুকের কান্না তখন দু'চোখ জমে উঠছে। চোখ দিয়ে হুহু করে পানি এসে গেলো। ওর মাথা নামিয়ে রেখে ছুটে এলাম। কেন না বলবার মতো যে আমার কথা ছিলো না।

তারপর সারাদিন, সারাদিন শুধু ভাবলাম। আমি একি করছি। কিন্তু ভাবনার সুতো বারংবার ছিঁড়লো। শুধু মনে হতে লাগলো, আনিস ফিরে এসেছে।

এই এক আশ্চর্যবোধ। আমি যেন আর একাকী নই। আমার যন্ত্রনা হলো দ্বিগুণতর। এমন যন্ত্রনা কোনদিন ছিলো না আমার। একদিকে শুধুই নিজেকে বলছি, এবার তোমার মরা ভালো। আর অন্যদিকে মনের ভেতরে আমার সব সুখ সব সাধ ফুলের মতো ফুটে উঠছে, বাঁচার সাধে বার বার হাত বাড়াচ্ছি সম্মুখের দিকে। . আমি ওর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতে পারলাম না সারাদিন। তবু মনে হলো কে যেন আমার পাশাপাশি রয়েছে সর্বক্ষণ। আর কেবল ওকে দেখতে ইচ্ছে করছিলো। জানি না এরই নাম ভালোবাসা কি না। মনের ভেতরে কেউ যেন বারবার ধমকে উঠছে। বারবার ক্রুদ্ধস্বরে বলছে, এটা অন্যায়, পাপ হচ্ছে তোমার। কিন্তু মনের সে-কথা শুনবো যে সে ধৈর্য কোথায়! শুধু অনুভবের তীব্র তারে বাজতে লাগল, সারাদিন, সারাদিন। একবার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললাম, আর অমনভাবে চলে যেও না তুমি, বাড়ীর সবাই ভাবছিলো। কি আশ্চর্য কতো সহজে মুখ দিয়ে তুমি বেরিয়ে এলো। ওকে কোনদিন তুমি বলিনি। কথাটা উচ্চারণ করেও আমার কোন রকম সঙ্কোচ হলো না। নিজেকে অদ্ভুত সহজ আর স্বাভাবিক আর মুক্ত মনে হলো। ও কি উত্তর দিলো শুনতে পেলাম না। ওকে পাশ কাটিয়ে চলে এলাম।

এখন ও নিজের ঘরে পড়াশোনা করছে। কতরাত এখন কে জানে! বাড়ীর ঘড়িটা অনেকক্ষণ আগে বারোটা ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে।

আমার ঘুম পাচ্ছে না। গত রাতে যে স্বপ্নটা দেখেছিলাম, সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়লো আমার।

আমি যেন নির্জন এক সমুদ্রের তীরে বালির ওপর বসে রয়েছি। সমুদ্রের ঢেউ আমার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছে। হাওয়ায় আমার শাড়ীর আঁচল উড়ছে, পায়ের কাছে অসংখ্য ঝিনুক—সাদা, ধূসর, কোনটা বা রামধনু রঙের। মাথার ওপরে কয়েকটা সমুদ্র-ঈগল বিশাল ডানা ছড়িয়ে উড়ছে আর চিৎকার করছে। দৃষ্টির সম্মুখে অতিকায়

একটা মাছ ভেসে উঠলো। মাছটার সাদা ধবধবে বিশাল বুক দেখলাম। আর সেই হাওয়া, সেই সমুদ্র গর্জন, সেই ঈগলের চিৎকার আমাকে ডেকে নিতে চাইলো সমুদ্রের অনেক গভীরে। আমার সব ভালোলাগা, আমার সব সাধ, সব সুখ তখন আমাকে নিঃশেষ করে মিশে যেতে বললো সেই সমুদ্র-উপকূলে। আর আমি হারিয়ে গেলাম। অণু অণু হয়ে নিবিড় আর গভীর শান্তির ভেতরে আমি যেন মিশে গেলাম।

কেউ ছিলো না আমার সঙ্গে। কেউ না। কি আশ্চর্য, সেই স্বপ্নের মধ্যে একাকী শুধু আমিই।

আনিস ভাই এলো আজ। আমার জীবনের সব সুখ, সব সাধ যেন ভরে উঠলো। কিন্তু তবু যে ভয় আমার। কী যেন ভয়ঙ্কর ভয় লুকিয়ে রয়েছে। আমি জানলাম, আনিস জানলো, কিন্তু তবু যে ভয়ে আমার বুক কাঁপে। কী করবো এখন? মা জানতে পারবে, আজ না হোক, কাল। জানবে বাতুল, আব্বা। তখন আমি এ মুখ কোথায় লুকোবো। আমার মরণ ভালো এখন।

তার চেয়ে, তার চেয়ে আমি চলে যাই এখান থেকে। থেকে কি লাভ! আনিস কষ্ট পাবে। কষ্ট পাবো আমি নিজে—দু'জনে কোনদিন সুখী হতে পারবো না। কোনদিন না। তার চেয়ে এই ভালো। না'হলে আনিস ভাইকে মা ছেড়ে কথা বলবে না। পাড়া-প্রতিবেশীর কানে উঠবে কথাটা, মা-ই হয়তো তুলবে। হায়রে আমার নিজের মা-ই যে সব চাইতে বড় শত্রু।

শুধু কি মা, বাবা যখন জানবে? যখন জানবে আনিসের বন্ধুরা? বাবা হয়তো আনিসকে ঘৃণা করবেন। বাবার স্নেহ থেকে চিরকালের জন্যে আনিস বঞ্চিত হয়ে যাবে। তার চেয়ে, তার চেয়ে আমার চলে যাওয়াই ভালো।

আজকাল এ বাড়ীটা সুখী। বাবা নিয়মিত দোকানে বসছেন, মা'র শাড়ী জামা আসছে নতুন নতুন। মমু পুতুল ওদের কাপড় জামা হচ্ছে।

আমিও নতুন কাপড় পেয়েছি। বাবা সরিষা কিনে রেখেছিলেন সিজনের সময়, বেশী দাম পেয়ে এখন বাজারে ছেড়েছেন। লাভ এসেছে প্রচুর। একেকদিন সিনেমা দেখতে যাই সবাই মিলে। বেন্নুদা নিয়ে যায়। আর আসে আকরাম চাচা। ওদের বয়সের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও খুব বন্ধুত্ব। মা'র সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে সময় সময় আকরাম চাচা। আমি শুনি দরজার আড়াল থেকে আর লজ্জায় দু'কান লাল হয়ে ওঠে। কি বিশ্রী, নোংরা কথা ওসব। আরো অবাক কাণ্ড বেন্নুদার সামনেই মা সব ওকথা বলে, অমন ধরনের কথা শুনে সময় সময় ওরা দু'জন হেসে ওঠে। বেন্নুদা আর আকরাম চাচা। কখনো বা মা হেসে ওঠে কোন তুচ্ছ কথাতেই। খিল্‌খিল্‌ সে হাসি যেন থামতেই চায় না। হাসির গমকে আঁচল খসে পড়ে মেঝেতে। সমস্ত শরীর দুলতে থাকে, তবু হাসে মা।

আজকাল মা স্নো পাউডার ব্যবহার করছে। নানা রঙের জামা উঠছে গায়ে। শাড়ীর রঙ বদলাচ্ছে দৈনিক। আর কি অবাক, এতো ধরনের অন্তর্বাস পরতে পারে আজকাল মা! আমার নিজেরই লজ্জা করে মা'র দিকে চোখ তুলে তাকাতে।

আর সে জন্যে, হ্যাঁ সে জন্যেই ছাড়লাম সবকিছু। সাদা ছাড়া আর কিছু পরি না। পরতে পারি না আজকাল। অস্বস্তি লাগে। স্নো পাউডার ব্যবহার করি না। করতাম না অমনিতেই তবু বাইরে বেরুবার সময় একটু আধটু ইচ্ছে করতো। এখন সে সব হাত দিয়ে ছুঁতে আমার গা বিজবিজ করে ওঠে। আমার কেবলি বিস্ময়, কেন করছে মা এসব!

বাবা দেখছে আর হাসছেন। মাকে এখনো ছেলেমানুষ মনে করেন। তিরিশের ওপর বয়স হলো মা'র। তবু বাবার কাছে মা ছেলেমানুষ। বাবা হাসেন দূর থেকে। সস্নেহে প্রশ্রয়ের চোখে তাকান।

মাঝে মাঝে আমার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে। কেন বাবা ধমকে উঠছেন না মাকে! কেন সেই সাজ-পোষাক আর স্নো-

পাউডারগুলো প্রাচীরের ওপারে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন না। ভয়ঙ্কর রকমের সর্বনাশ। স্রোতের মুখে ভাসতে যাচ্ছে মা। কেন বাবা বাধা দিচ্ছেন না ?

আমি বুঝতে পারি। মা'র মন আর সংসারে নেই এখন। কেবলি মা বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছে। থেকে থেকে বাইরে বেরুবার জন্যে ছটফট করে উঠছে। শুধু আমি কেন, রাহুল, আনিস ওরাও দেখলো। আর সে জন্যেই কি না, কে জানে, রাহুল আজকাল মা'র সঙ্গে কথা বলে না। আনিস কথা বললেও মা'র মুখের দিকে তাকায় না।

জানি আমি বুঝতে পারি, ওদের মনের ভেতরে ঘৃণা জমে উঠছে। কিন্তু তা প্রকাশ করতে চায় না ওরা। আর চাইলেও তা পারে না।

এটা এখন একটা সুখী বাড়ি। কোন ঝগড়া নেই, কোন অসুবিধা নেই কারো। বাইরে থেকে দেখলে যে কারো ভালো লাগবে। মনে হবে সুন্দর একটি সুখী পরিবার। মালিকের হাতে অনেক টাকা, ছেলেমেয়েরা সবাই হাসি-খুশি—একটা পরিবারের জন্যে আর কি দরকার !

কিন্তু এ সবই বাইরের মুখোস। মনে হয় তীব্র ছুটো স্রোত বয়ে যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে। এমন স্রোত যেন কোনবার আসে নি। বাইরে সবাই নিয়ম বাঁধা গতানুগতিক কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু সেই অন্তঃস্রোতে ওরা আলাদা। মা একাই একদিকে আর অন্যদিকে আনিস, রাহুল, আর, আর হয়তো আমিও।

একটা ভয়ঙ্কর সর্বনাশ যেন ঘনিয়ে আসছে। স্রোতের প্রবল টানে কী যে ধ্বংস হবে বলা যায় না।

চৌধুরী বাড়ীর ভিতে লোনা লেগেছে। এবার ভাঙবে, ভেঙে পড়বে বিরাট বাড়ীটা। আর সেই ধ্বংস স্তূপে কে যে চাপা পড়বে কিছু বলা যায় না।

আনিসের মুখোমুখি হতে পারি না, কিন্তু মন ভরে আছে ওর উপস্থিতিতে। একই বাড়ীতে আছি, একই বাড়ীর ভেতরে নিঃশ্বাস

নিচ্ছি আমরা। ওর ঘরের ভেতরে কতোবার যেতে হচ্ছে, কতোবার ও আমার পাশ দিয়ে হাঁটছে, হয়তো দরকারী দুটো একটা কথাও বলছে, কিন্তু শুধু কথাই, আর কিছু না।

আমি মন ভরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারি না। ওর হাত ধরতে পারি না। বলতে পারি না অনেক রাতে ওর ঘরে গিয়ে, আর রাত জেগো না, এখন ঘুমোও। আমার মনের কোন ইচ্ছেই পূরণ করতে পারি না। কিন্তু তবুও আমি মনে মনে সুখী। প্রার্থনা করছি, যেন এমনি থাকতে পারি পাশাপাশি চিরদিন। শুধু এটুকুর জন্যেই আমি সব করতে পারি। হ্যাঁ, সব।

হায়রে! আমার এই সুখটুকু যেন স্রোতের ঘোলা জলে ভেসে যাওয়া পদ্মপাতার ওপর একফোঁটা টলমল পানি। আমার চারপাশে এমনি ঘৃণা, লোভ, হিংসা আর ক্রোধ উদ্যত রয়েছে তবু আমি এরই মধ্যে শান্তি পাচ্ছি একটুখানি। যদি আনিস এ বাড়ীতে না থাকতো তাহলে আমি বোধ হয় বাঁচতে পারতাম না।

কেবলই মনে হয়, আছে, আছে। আমার আর যেন কোন কামনা নেই, ইচ্ছে নেই। মনে মনে আমি সুন্দর হয়েছি, শুভ্র হয়েছি। আমার শরীরে গয়না নেই, কতো দিন চুল বাঁধি না, প্রসাধন করি না—তবু যেন মগ্ন রয়েছি আশ্চর্য কোন স্বপ্নের ভেতরে।

মাঝে মাঝে মা লুকিয়ে দেখে আমাকে। যখন আমি স্নানের পর বাথরুম থেকে বেরিয়েছি, কিম্বা যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছি, তখন। হ্যাঁ, তখনই যেন মা তীক্ষ্ণ চোখে খোঁজে কিছু।

কিছু যেন রয়েছে আমারই শরীরে। আতি-পাঁতি সেই দৃষ্টি অনুভব করি আমি শরীরময়। আর সমস্ত শরীর আমার শিউরে ওঠে। আমি একাকী অনেক সময় নিজেও কৌতূহলী হয়েছি, কী খোঁজে মা অমন করে! নিজেকে দেখেছি খুঁজে, আর বিস্ময়ে, মোহে অবাক হয়ে গিয়েছি। শরীরও এতো সুন্দর হতে পারে কে জানতো! আর

সেই শরীরটা আমারই। দেখছি আমার শরীরময় যেন সুন্দর একটা আলোর আভা জড়ানো। আমার বুক সুন্দর, আমার কোমর সুন্দর, আমার গ্রীবা সুন্দর। আমার দু'চোখের ভেতরেও যেন এখন পুরনো আমিকে খুঁজে পাই না। যাকে আমি আজন্ম দেখতে চেয়েছি গোপনে গোপনে সে-ই যেন এসে দাঁড়িয়েছে আমার রক্ত-মাংসের ভেতরে।

বুঝলাম সুন্দর হয়েছি আমি। বুঝলাম আমি আরো শুভ্র হয়েছি।

খালা আম্মা এসেছিলো সেদিন। আমাকে বারান্দায় দেখে, বেশ কিছুক্ষণ নজর ফেরালো না। তার সঙ্গে এসেছিলো ওর ভাসুরের মেয়ে তাজিনা। এখন কলেজে পড়ছে। দূরে দূরে একটু জানাশোনা ছিলো। আর অনেকদিন পর আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলো। বললো, তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলাম।

ওকে নিজের ঘরে নিয়ে এলাম। বললাম, বলুন, কি বলবো?

অল্প হাসলো তাজিনা, অমনভাবে বুঝি গল্প হয়?

জোর করে হাসতে হলো আমাকেও। বললাম, কী ভাবে গল্প করতে হলে?

তুমি ভয়ানক গম্ভীর।

আমি গম্ভীর? এবার হেসে ফেলতে হলো আমাকে।

না ঠিক গম্ভীর না, তবু যেন কী। তুমি যেন আলাদা। আর ক'মাসে এতো সুন্দর হয়েছো তুমি যে চেনাই যায় না।

আমি সুন্দর হয়েছি? আমি ওর কথাটা তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে চাইলাম।

বাঃ বিশ্বাস হলো না। একবার বাইরে বেরিও। যে দেখবে তারই মুণ্ডু ঘুরে যায় কিনা দেখো।

আমি খুশি হচ্ছিলাম মনে মনে। তবু সংযত থাকতে হচ্ছিলো।

আচ্ছা এমন ভাবে থাকো কেনো তুমি? তাজিনা একটু পর জিজ্ঞেস করলো।

কি করব ?

এই বিধবার বেশ কেন ? সাদা জ'মা, সাদা শাড়ি, চুল বাঁধা নেই। দেখে মনে হচ্ছে একটা বিরাট কিছু যেন ঘটে গিয়েছে।

বাঃ বাড়িতেও কি সেজেগুজে থাকতে হবে ?

সাজবার কথা কে বলেছে ? একটু রং নেই পোশাকে, হাতে একটা গয়না নেই—এ-রকম কোন মেয়ে থাকে না।

আমিও থাকি না, নিজেকে লুকোতে হলো তখন। আজ ক'দিন ধরে শরীর খারাপ যাচ্ছে। তাই....

ভ'জিনা যাওয়ার আগে কানে কানে বলে গেলো, খবরদার বাইরে বেরুবে না। যে তোমাকে দেখবে, তারই মাথা খারাপ হবে।

খালা আম্মাও একই মন্তব্য করলো। মাকে ডেকে বললো, তোর মেয়ে তো দিনকে দিন সুন্দর হচ্ছে। ওকে বিদায় করবার ব্যবস্থা কর।

দেখো তোমরাও। মা জবাব দিলো, আমি একা কি আর পারবো।

তবু একাই করতে হবে তোকে। আমার নিজেরই গলায় বিষ-কাঁটা লেগে আছে। ওটার ব্যবস্থা করতে পারবো কি না সেই চিন্তায় মরছি আমি।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছি। তারপর শুনলাম সেই কথাটা। মেজো খালাই বললো, এক কাজ করলেও তো পারিস, হাস্না বুবুর ছেলে বেনু তো হাতেই রয়েছে। ওকে ধরলেই তো হয়।

বেনুর কথা আমিও ভেবে রেখেছি। কিন্তু ভালো একটা চাকরি-বাকরি না হলে....

আরে ভালো চাকরির কথা তুলে লাভ কি, মা খালার কথা শেষ হবার অনেক আগেই বলে উঠেছে। যা দিনকাল! কনট্রাক্টরীর চাকরি করছে তাই বা মন্দ কি! ষাট সত্তর টাকা নিশ্চয়ই পায়। এদিকে মেয়ের মুখ দেখে তো বিয়ে হবে না, টাকা-পয়সা লেখা-পড়া এ সবও তো খোঁজে ছেলেরা।

আমি জানতাম, এ-কথাটা উঠবে একদিন না একদিন। হয়তো হাসুা খালাই পাঠিয়েছে কথাটা পাড়বার জন্যে। কিংবা হয়তো মেজো খালা। এমনিই বললো। তবে এ রকম ধারণা প্রায় সবারই! রেনুদাও হয়তো সেই কথাই ভেবে রেখেছে!

এ নিয়ে আমি ভাবলাম না। ভাববার কি আছে এতে? এ রকম কথা তো বলবেই ওরা। আমার মন ঘিরে সেই একটি কথা বারবার বেজে উঠলো গানের মতো, আমি সুন্দর!

হ্যাঁ, আমি সুন্দর। আর সুন্দর হয়েছি যে তোমারই জন্যে। তোমারই জন্যে আমি শুভ্র হবো, পবিত্র হবো।

আনিস কি দেখেনি আমাকে? ও কি দেখেনি আমি কতো সুন্দর হয়েছি? জানি না, আমি কিছুই জানি না ওর মনের কথা।

আনিস অনেক বেলাতে ঘুম থেকে ওঠে। অনেক রাত জাগতে হয় ওকে। যখন ঘুম থেকে ওঠে, আমার তখন সকাল বেলাকার স্নান হয়ে গেছে, রান্না ঘর আর বারান্দাগুলো ঝাঁট দিয়ে ফেলেছি, চা নাস্তা তৈরী করে, মমু-পুতুল ওদের মুখ ধুইয়ে নাস্তা খেতে দিয়েছি। আর তখন ওঠে ও।

ঘুম থেকে ভোর সকালেই উঠে যখন আমি রোজকার মতো বাইরের ঘরের বারান্দায় আসি, তখনও আনিস গভীর ঘুমে অচেতন থাকে। আমি মশারীর বাইরে থেকে দেখি ওকে। দেখি দু'টি চোখের পল্লব কী শান্ত, দু'টি ঠোঁটে যেন স্বপ্নের হাসি। এলোমেলো চুলে গভীর স্বস্তি। আর শিথিল হাতে পরম নির্ভরতা।

আমার মনে তখন যেন কেউ অস্ফুট কণ্ঠে ডেকে ওঠে, আনিস! আনিস! কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি চলে আসি।

সেদিন জানালার পাশ দিয়ে যেতেই চমকে গেলাম। বাইরের দিককার দরজা খোলা। আর সেই ভোরের আলোয় আলোকিত দরজার

মাঝখানে আনিস দাঁড়িয়ে। পায়ের শব্দে সেই মুহূর্তে পেছনে তাকিয়েছে।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। যাবো কি যাবো না। আর তখন আনিস দু'পা এগিয়ে ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়েছে। ও ডাকলো মৃদু কণ্ঠে, সেও শুনতে পেলাম কি পেলাম না, এসো।

আমি দাঁড়িয়েছি। যাবো কি যাবো না। তখনও রাস্তা নির্জন। ভোরেব স্নিগ্ধ হাওযা বইছে। শুকতাবা দপ্ দপ্ কবে জ্বলছে পূবের আকাশে। বাড়ীতে কেউ জেগে উঠেনি।

আমি এক পা দু'পা কবে এগোলাম। পাযে পাযে যেন লজ্জা জড়িযে ধবলো। আনন্দে আবেগে আমার মুখ দিযে কথা বেরুলো না।

ওব মুখোমুখি দাঁডালাম। ও হেসে বললো, এতো সকালে যে।

বাঃ রোজ ভোরেই তো ঘুম ভাঙে আমার।

তোমাকে দেখে আমার হিংসা হয, কি সুন্দব ঘুমোতে পারো তুমি।

কেন, ঘুম হযনি বাতে ?

না, কিছুতেই রাতে ঘুম এলো না।

সেকি। আমি ওব মুখের দিকে তাকিযে দেখলাম। না ঘুমনো লাল চোখ, সারা মুখে ক্লান্তি।

কেন জানি না আমার তখন কান্না পেলো। আমি ওর মুখের দিকে তাকিযে বললাম, কী ভাবো তুমি এতো! এতো কষ্ট পাও কেন ?

ও আমাব কাছে এগিযে এসে কাঁধে হাত রাখলো। বললো, জানি না কেন ? তবু ভাবনা আসে, কষ্ট পাই।

তারপব কাছে টানলো আমাকে। আমি ওর কাঁধে মাথা রাখলাম। আর সেই ভোরে, সেই আশ্চর্য ভোরে, যখন সকালের আলো ফুটছে, আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম সারা জীবনের ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। আর অস্ফুট কেঁদে উঠলাম, না, ভেবো না তুমি। এমন করে নিজেকে কষ্ট দিও না।

আবেগের সেই মুহূর্তে কিছুই মনে নেই আমার। শুধু এটুকু অনুভব করছিলাম, যেন মস্ত বড় আশ্রয় পেয়ে গিয়েছি। ও তখন দু' হাতে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে। আমার বুকের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইলো, তবু যেন তীব্র সুখ ছিলো সে রুদ্ধশ্বাস আলিঙ্গনে। ওর মুখ নেমে এলো এক সময়। তারপর, আমার সব সাধ, সব কামনা, সব দুঃখ, সব আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে নামলো আমার দু'টি ঠোঁটের ওপর।

ভয়ে না আনন্দে, লজ্জায় না যন্ত্রণায়, জানি না, আমি ওর দু' হাতের মধ্যে বাঁধা ছিলাম। এক সময় বললাম, আমি যাই। ও ছেড়ে দিলো আমাকে।

কিন্তু মুখে বললে কি হবে, আমি ওকে ছাড়তে পারছিলাম না। বুকের কোথায় যেন কান্না জমে উঠেছিলো। আবার ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম। আর কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

এবার ওর দুটি হাতে অনেক কালের সান্ত্বনা আর আশ্রয় নেমে এলো। আমার চুলে, আমার পিঠে, আমার গলায় হাত বুলিয়ে দিলো ও। বললো, ছি! সাত সকালে উঠে নাকি কেউ কাঁদে, কি হয়েছে?

জানি না, বলে আমি একেবারে চুপ করে গেলাম।

সত্যি যে জানতাম না। ও পাশে দাঁড় করালো আমাকে, বাঁ হাতে জড়িয়ে। তারপর কাঁধের কাছে মুখ নামিয়ে বললো. পারলাম না আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে। তোমার হয়তো ঘৃণা হবে।

না, না, আমি মাথা নেড়েছি তখন। কি বাজে কথা বলছো। আমিও তো পারলাম না।

ও আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এতো সুন্দর হলে কেন তুমি?

আমি সরে এলাম তারপর। সেই ভোর, কি আশ্চর্য ভোর। অমন স্নিগ্ধ জীবনে কোনদিন পাই নি। আমার সমস্ত মনে দেহে

তখন আনন্দের ঝঙ্কার বাজছে। আমার গান গাইতে ইচ্ছে করলো সারা সকাল।

কিছুক্ষণ পর ওর ঘরে এলাম নাস্তা দিতে। এসে দেখি ও আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর দু' ঠোঁটে তেমনি মৃদু হাসি, দুটি নিমীলিত চোখে তেমনি অপার স্নিগ্ধতা। আমার লোভ হলো। ওর শুকনো নরম চুলে আঙ্গুল ডোবালাম একবার। তারপর ঝুঁকে পড়ে, ওর চোখে আস্তে, প্রায় স্বপ্নের মতো, চুমু খেলাম।

হায়রে, এই যদি সুখ হতো ! এই যদি তৃপ্তি হতো !

মানুষ যদি জানতো সাধের সীমানা। যদি জানতো শরীরের ভেতরকার জানোয়ারটার লোভের সীমানা।

জানিনা বলেই যে অতৃপ্তি। জানিনা বলেই যে যন্ত্রণা।

এরই নাম কি ভালোবাসা ! এমনি ভ'রে থাকা, এমনি নিজের মনের ভেতরে বিভোর হয়ে যাওয়া। এমনি একাকী সুখী হওয়া। এই কি চায় না মানুষ সমস্ত জীবন ধরে !

এরই জন্যে আমি সারা জীবন ধরে কষ্ট করতে পারি, এরই জন্যে আমি যুগ-যুগান্ত বেঁচে থাকতে পারি। এরই জন্যে আমি পবিত্র হতে পারি, শুভ্র হতে পারি।

আমি সুন্দর, আমি সুন্দর। আর কিছু চাওয়ার নেই, আর কিছু পাওয়ার নেই। এখন আমার চারপাশে যতো ঘৃণা বয়ে যাক, যতো গ্লানি বয়ে যাক, যতো সন্দেহ আর সংশয় ঘনিয়ে উঠুক, আমার কোন ক্ষতি হবে না।

আমি এই সেদিনও চলে যেতে চেয়েছিলাম। আনিসের কাছাকাছি যেতে যে ভয় ছিলো, সেই ভয়কে তুচ্ছ করে কেউ যেন আমাকে ঠেলে দিলো সম্মুখে। এখন পেছনে পা রাখার কথা আমি ভাবতেও পারি না। নিশ্চিত জানি একদিন না একদিন এ ব্যাপারটা মা'র

চোখে পড়বে। মা হৈ-চৈ করবে এ-নিয়ে। জানবে রাহুল, ছোট আপা, আনিসের বন্ধুরা। আনিসের সঙ্গে বাবার সম্পর্ক চিরকালের জন্যে আলাদা হয়ে যাবে। তখন আমি কোথায় দাঁড়াবো? এই ভাবনাতে ভয়ে আমার বুক কেঁপে ওঠে। ভাবতে গেলে শিউরে উঠি। কিন্তু আর যে পথ নেই। এখন এ বাড়ী ছেড়ে যেতে আমার শরীর আর মনের পরতে পরতে কান্না বাজে।

আমি কি চিরকালই কাঁদবো! জন্ম হওয়া অবধি তো শুধু কাঁদছিই।

আমার সম্মুখে যেতে কান্না। পেছনে যেতে কান্না। এখন আমি কি করবো!

এদিকে ঘটনাগুলো নিজের নিয়মে ঘটে যাচ্ছে। অসম্ভব রকমের দ্রুত। সব ঘটনার মাঝ খানে রয়েছি আমি। তবু লক্ষ্য রাখতে পারছি না কোন ঘটনা কি ভাবে এগিয়ে আসছে। কোন ঘটনা আমাকে শুভ্রতার দিকে নিয়ে যাবে আর কোন ঘটনা ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে ঘৃণার পঙ্ককুণ্ডে। মানুষগুলোও আসছে নানান রূপ ধরে। বুঝতে পারি কিছু একটা ঘটে যাবে। আর তা ঘটবে খুব শীগগীরই। হয় আমি বাঁচবো, নইলে মরবো।

বাবা আজকাল দোকানেই থাকছেন। ইন্‌সিওরেন্সের টাকাটা পেয়ে যাওয়াতে দেনা শোধ হয়েছে। এখন দোকানটা দাঁড় করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। কোনদিন দুপুরে খেতে আসেন না আজকাল। আসেন অনেক রাতে। কোন কোনদিন তাও আসেন না। শরীর খুব ক্লান্ত থাকে। কোন হোটেলে খেয়ে দোকানেই ঘুমিয়ে পড়েন। আনিস রংপুরে সরকারী চাকরি পেয়ে গেছে। শীগগীরই যাবে। ছোট আপা নার্সিং ছেড়ে দিয়েছে। এখন চাকরি নিয়েছে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার-এ। কে জানে হয়তো দূরে কোন মফঃস্বলে পাঠিয়ে দেবে। আমি জানি ছোট আপা আর এ বাড়ীতে ফিরবে না।

রাহুল পড়াশোনা একদম বন্ধ করে দিয়েছে। সারাদিন ওকে

বাড়ীতে দেখা যায় না। কোন সময়েই বাড়ীতে থাকতে পারে না। ওর সারা মনে ঘৃণা ছেয়ে আছে। একেক সময় নিজেকেও ঘৃণা করে। কিন্তু কেউ জানে না। ওর মনের কথা কেউ জানে না। কারুকে ও কোনদিন বলবে না। বাবাকে না, আমাকে না, আনিসকে না।

হয়তো বলতো, যদি বাবা বাড়ীতে থাকতেন, যদি নিজের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে মা'র ওপর কথা বলতে পারতেন, তাহলে হযতো বলতো। কিন্তু বাড়ীর ভেতরকার ব্যাপারে তো মা-ই সব। আর মা' যা করে তাইতো বাড়ীতে হয়। মা'র ওপর কারো কথা এ বাড়ীতে চলে না। বেনুদা আসে, আকরাম চাচা আসে। রাহুল ওদের সহ্য করতে পারে না। কিন্তু কিছু করারও পথ খুঁজে পায় না। আর সেই জন্যই হয়তো ও বাড়ীতে থাকতে পারে না।

আমি যে দিন ওকে ধরেছিলাম। ও ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়েই চলে যাচ্ছিলো। বাড়ীর আর কেউ তখনও ঘুম থেকে উঠেনি। ওকে দরজার কাছে ধরে ফেললাম। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাস তুই রোজ।

বাইরে, গম্ভীর হলো ও।

পরীক্ষা না তোর সামনে! কেমন করে পরীক্ষা দিবি।

আমি পরীক্ষা দেবো না মঞ্জু, কি হবে পাশ করে? এখন ছোট লোক হয়ে যেতে পারলেই বেঁচে যাবো। বড়লোক হওয়ার শখ আমার নেই।

রাহুল আমার থেকেও বয়সে ছোট। কিন্তু গম্ভীর ভাবে কথা বলছে। ওর কোন বিশ্বাস নেই এখন কারো ওপর। নিজের ওপর থেকেও বিশ্বাস হারিয়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে দেখতে কস্ট হলো আমার।

বললাম, তুই আকরাম আর বেনুকে সহ্য করতে পারিস না, তাই না?

ও কিছু বললো না, আমার দিকে তাকিয়ে দেখলো। আমি তখন বললাম, আমার কথা ভেবে ছাখ তো, আমার চোখের সামনে কতো কিছু ঘটে যাচ্ছে, আমাকে কত অপমান সহ্য করতে হয়, আমারও

একেক সময় অসহ্য মনে হয়। কিন্তু আমি তো আর পালিয়ে যেতে পারি না। তুই পালিয়ে বাঁচিস, কিন্তু আমি কি করবো! আমিও কি মরবো ওদের সঙ্গে থেকে থেকে?

রাহুল আমার প্রশ্নের কোন জবাব দিলো না। বললো, আমি কিছু জানি না মঞ্জু। আমি কিচ্ছু করতে পারি না। তুই বরং তোর দাদুর কাছে চলে যা। এ বাড়ীটা থাকবে না। আমি বলছি তোকে, কিচ্ছু থাকবে না এ বাড়ীর।

আমারও মনের ভেতরে কেউ যেন সায় দিয়ে উঠল, না কিচ্ছু থাকবে না এ বাড়ীর।

তাহলে আমি? আমি কোথায় যাবো? আমার কি হবে?

কি হবে, কি হবে এই আশঙ্কা আমার মনের ভেতরে যেন ছেয়ে গেলো। বুঝলাম অস্পষ্ট ভাবে। আমাকে পালাতে হবে এ-বাড়ী থেকে। পালানো ছাড়া আর কোন বাঁচবার পথ নেই।

জানি পালাতে হবে, কিন্তু তবু যে পারি না। আনিসকে দেখবার সাধটাকে বাদ দেবো কেমন করে! আমার এই যন্ত্রণার আর মধুর দিন ক'টা একেবারে হারিয়ে যাবে? মনে মনে ঠিক করলাম, আনিসকে বলবো আমার ভাবনার কথা।

আনিস হঠাৎ রংপুরে চলে গেলো আজই। ওর যাওয়ার সময় বাড়ীতে আকরাম ছিলো (ওকে চাচা বলতে ঘেন্না হয় এখন)। বাড়ী থেকে বেরুবার আগে খেতে চাইল আনিস। মা বললো, রান্নাঘরে ভাত ঢাকা আছে, নিয়ে খাও।

আনিস কিছু বললো না। আমি গেলাম রান্না ঘরে, ভাত বেড়ে দিলাম, গ্লাসে পানি ঢেলে দিলাম। এক সময় জিজ্ঞেসও করলাম, কি ভাবছো এতো?

মাথা ঝাঁকালো আনিস, না কিছু ভাবছি না।

আবার চুপ। আমি একটু পরে আবার জিজ্ঞেস করলাম। কবে ফিরবে?

দু'দিন পর। স্বল্প জবাব ওর।

তারপর রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পাশের ঘরে তখন মা আর আকরাম কি একটা কথায় হেসে উঠেছে। আমি বারান্দা দিয়ে হাঁটবার সময় মা'র চাপা গলা শুনলাম। আঃ ছাড়ো, মঞ্জু আসছে।

আমার কানে তখন জ্বালা ধরেছে। কেউ যেন চরম অপমান করলো সেই মুহূর্তে। যেন কোন বিষাক্ত সাপ আমার শরীরে ছোবল মারলো! আমি ইচ্ছে করে পায়ের শব্দ তুলে সরে এলাম বারান্দা থেকে।

আমার নিজের ঘরে মম আর পুতুল খেলছিলো। ওরা আমাকে খেলতে ডাকলো। ওদের কথায় কান দিতে পারলাম না। এক সময় শুনলাম আনিসের গলা।

বললো, চললাম আমি।

কেউ সাড়া দিলো না ওর কথায়। আমিও না। আমার দেখতে ইচ্ছে করছিলো, ইচ্ছে করছিলো যাওয়ার আগে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াই। এগিয়ে দিই গেট পর্যন্ত। কিন্তু পারলাম না! বসে রইলাম সেই ঘরে। মম, পুতুল, আর আমি। বারবার মা'র সেই চাপা হাসি আর সেই কথাটা কানের কাছে শুনলাম। সব মিলিয়ে বিশ্রী লাগলো।

মম আর পুতুল কি জন্যে যেন চিৎকার করছিলো, ওদের বললাম, তোরা মায়ের কাছে যা।

না, পুতুল জবাব দিলো।

কেন?

ঘরে আকরাম চাচা আর মা গল্প করছে। মা এ ঘরে খেলতে বললো!

আমার অনেক দিনের পুরণো একটা ঘটনা মনে পড়লো। হ্যাঁ আমিও পুতুলের মত ছিলাম তখন। পুতুল যেমন কথা বলছে তেমনি আমিও এক সময়ে বলেছি।

তখন মা নানার কাছ থেকে দাদুর ওখানে যেতো। থাকত দু'এক

মাস। সেই সময় আসত কবির চাচা। ঢাকায় লেখাপড়া করত, ছুটিতে আসতো বাড়ীতে। আর সারাটা ছুটি ও মা'র সঙ্গে রোজ দুপুর-বেলা গল্প করতো। নিঝুম দুপুর তখন, গোটা বাড়ীটা নিঃশব্দ। এমন সময় কবির চাচা মা'র ঘরে যেতো।

সেই অস্পষ্ট ঘটনাগুলো আজ স্পষ্টতর হলো। একবার দু'জনে ঘরের মধ্যে পাঞ্জা লড়ছিলো, কার গায়ে জোর বেশি। কবির চাচা লিক্‌লিকে হাল্কা মানুষ। মা ওকে হারিয়ে দিতে পারতো, কিন্তু মা নিজেই বারবার হেরে যাচ্ছিলো। আমি দেখছিলাম দু'জনের কাণ্ড। খুব মজার ব্যাপার মনে হয়েছিলো। লিক্‌লিকে মানুষ কবির চাচা জিততে পারছিলো দেখে হাসি পাচ্ছিলো আমার।

তারপর, হাঁ এ ঘটনাও মনে আছে।

চাপা হাসিতে দু'জনে এক সময় হুমড়ি খেয়ে পড়লো, একে অন্যের ওপর। আর তখন মা কবির চাচাকে কাতুকুতু দিতে আরম্ভ করলো। কবির চাচাও ছাড়ে নি। দু'জনে মেঝেতে গড়াগড়ি করতে করতে হেসে সারা হচ্ছিলো, আর ঠিক তখনই ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে পিছিয়ে গিয়েছিলো রাহেলা ফুফু। ঘরের ভিতরে ওরা টের পায়নি। আমি লক্ষ্য করেছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাইরে এসে দেখি রাহেলা ফুফু দৌড়ে যেন পালিয়ে যাচ্ছে।

অমনি আমিও পালিয়ে এসেছি। রাহেলা ফুফু সেদিন কিছু দেখেনি, শুধু হাসির শব্দ শুনেছিলো, আর তাই শুনেই পালিয়ে এসেছিলো। আমাকেও পালিয়ে আসতে হলো, কিছুই দেখিনি, তবু।

সেই ঘটনার পরই মা'কে দাদু নানার ওখানে রেখে যান। মা তারপর আর কোনদিন যেতে পারে নি দাদুর বাড়ীতে। তখন বুঝতে পারি নি। মা যেতে চাইলেও কেন দাদু বারবার নিয়ে যেতে অস্বীকার করেছেন। এখন বুঝতে পারি সব কিছু। কিন্তু বাবা এখন কোথায় রেখে আসবেন মাকে? নানা বেঁচে নেই, মামারা

সবাই ক্ষৌৎ হ'য়ে গেছেন। মা'র যাবার জায়গা নেই কোথাও। আর থাকলেই কি পারতেন বাবা!

পারতেন না, আমি জানি। আহা, যদি পারতেন।

দুটো দিন কী অস্বস্তিতে যে কাটলো!

উঃ সেই দিন, কী ভয়ঙ্কর দিন।

তখন অনেক রাত। আমি তখনও জেগে রয়েছি ঘরে। আমার কাছে মম পুতুল শুয়ে। মা সন্ধ্যে হতেই বাবার জন্যে ভাত তুলে রেখে, ঘরের দরজা বন্ধ করলো। আমাকে ডেকে বললো, যা তুই শুয়ে পড়্‌গে, মম পুতুলকে নিয়ে যা তোর কাছে। আমার ভীষণ মাথা ধরেছে।

মা'র অমন মাথা ধরে মাঝে মাঝে।

তখন দু' একদিন খুব কষ্ট পায়।

আমার ঘুম আসেনি তখনও। আনিসের কথা ভাবছিলাম। সে দিনই আনিসের আসবার কথা ছিলো। তখন কতো রাত কে জানে। রাহুল সিনেমা গিয়েছে, তখনও ফেরেনি। সমস্ত বাড়ীটা চুপ।

এমন সময় বাবার গলা শুনতে পেলাম। সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন। তারপর আবার নেমে এলেন বাইরের ঘরটা পেরিয়ে। উঠান থেকেই পুতুলের নাম ধরে ডাকলেন, তারপর আমার নাম ধরে। কেউ সাড়া দিলো না।

তারপরই আমি বেরুলাম; আর তখনই বাবার ক্রুদ্ধ স্বর শোনা গেলো। মা'র নাম ধরে ডাকছেন, এই সালেহা, দরজা খোল। মা দরজা খুলছে না তখনও। আমিও ডাকলাম। বাবা হঠাৎ আমাকে ঘরে যেতে বললেন।

বুঝলাম। ভয়ঙ্কর কিছু যেন একটা হ'তে যাচ্ছে। মা দরজা খুলছে না কেন?

আমি ঘরে গেলাম না। বাবা আমাকেই বললেন, যা তো
বন্দুকটা নিয়ে আয়।

অতো রাতে বন্দুক কোথায় পাবো। বন্দুকটা আনিস ভাইয়ের ঘরে। আর সে ঘর তো বন্ধ।

আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। বাবার দিকে তাকালাম একবার। কী ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে তাঁর! চোখ দুটোতে আগুন জ্বলছে!

বাবা এগিয়ে প্রবল জোরে লাথি মারলেন দরজার ওপর। বিশাল শরীরের সজোরে লাথি খেয়ে দরজাটা ভেঙে পড়লো। এবং দেখলাম, মা সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর মা'র আড়ালে আকরাম। মা যেন আড়াল করে ধরেছে আকরামকে।

আমিও তখন ফুঁসে উঠেছি। বলছি, মারুন ওটাকে। মেরে ফেলুন।

আকরাম ভয় পেয়েছে তখন। কিছু বলছে না।

মা বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলছে, যদি মারতে হয়, আমাকে মারো আগে, তারপর ওর গায়ে হাত দিও। বাবা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছেন তখন মার দিকে তাকিয়ে। তাঁর চোখে ঘৃণা, ক্ষোভ, আর যন্ত্রনা এক সঙ্গে ফুটে উঠলো। কিছু বলতে গিয়েও যেন পারছেন না। আর সেই স্তব্ধ বিমূঢ় মুহূর্তে ঝড়ের বেগে আকরাম ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

বাবা তখনও কিছু বলছেন না। বাবার ওপর আমার রাগ হ'তে লাগলো। কেন কিছু বলছেন না!

অবশেষে বললেন। হ্যাঁ বললেন, থেমে থেমে, চরম ঘৃণায় যেন কথা বেরুচ্ছে না তাঁর। বললেন তুমি পশুরও অধম সালেহা, তোমাকে আমি ঘৃণা করি। তোমায় মুখ দেখিও না আমার কাছে।

বাবা না খেয়ে সে রাতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বাবা গেলেন আর আমার মনে হলো, তিনি চিরকালের জন্যে গেলেন আর আসবেন না কোনদিন।

সেই রাতে, সেই ভয়ঙ্কর রাতে আমি বুঝলাম, চৌধুরী বাড়ীর সব চাইতে শক্ত জায়গাটার ভিত ভেঙেছে এবার। আর বেশী দেরী নেই।

এই ঘটনা আমি কারুকে বলিনি। কাকে বলবো! নিজের মা'র অমন ব্যভিচারের কথা কাকে বলা যায়। মা'র মুখোমুখি হতে আমারও শরীরে কোথায় যেন ঘৃণা ঘুলিয়ে উঠতো।

উঃ সেই দিন কি ভয়ঙ্কর দিন। কেউ নেই বাড়ীতে। কেউ কথা বলছে না। রাহুল কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলো বোধ হয়। এক সময় আমাকে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে মঞ্জু?

আমি ওর মুখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললাম, না তো, কিছু হয়নি তো।

ও মৃদু হাসলো, ঠিক আনিসের মতো হাসে ও। স্বচ্ছ আর সুন্দর। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কিছুই বলতে পারলাম না তখন। কেমন করে উচ্চারণ করবো সেই অশ্লীল ঘটনাটা।

রাহুল আমাকে চুপ দেখে বললো, নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে, তুই হযতো জানিস না। তোর মা একদম চুপ, বেনুদাকে আসতে দেখি না। আকরামকে দেখলাম রাস্তায, মনে হলো তাড়া খাওয়া চোরের মতো।

আমি জোর করে হাসলাম, তোর আবার দেখা, কি দেখতে কি দেখেছিস্ তার ঠিক কি?

রাহুল জানে না এখনো। হে খোদা ও যেন জানতে না পারে। কি বিশ্রী, কি বিশ্রী। যতোবার মনে পড়লো ততোবার গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে উঠলো। গলার নিচ থেকে একটা বমির ভাব ঠেলে আসতে লাগলো ওপর দিকে।

অতো বড় বাড়ীটা এখন অথৈ নিঃশব্দতায় ডুবতে লাগলো। আমি রান্না করলাম, পুতুলকে খাওয়ালাম, মম'কে খাওয়ালাম। দুপুরে ওদের শুইয়ে রেখে নিজে বসলাম ঘরে। কোন অনুভূতি নেই এখন। কিছু ভাবছি না। প্রবল একটা ঝড়ের পর যেমন সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধ হয়ে যায়, আমার মন ছেয়ে তেমনি একটা স্তব্ধতা। মা ঘর থেকে বেরুলো এক সময়, তারপর স্নান করলো, ভাত খেলো, বারান্দা থেকে আমাকে ডেকে খেয়ে নিতে বললো। সব কাজ বয়ে চললো পুরণো নিয়মে।

কিন্তু সেই অগাধ অস্বস্তি আর নিঃশব্দ আতঙ্ক থেকে বাড়ীটা যেন মাথা তুলতে পারছে না।

আমি কি করি এখন। কি করি!

রাহুলের টেব্‌ল ঘেঁটে একটা পোষ্ট কার্ড পেলাম। তাতে চিঠি লিখলাম দাদুকে। এখানে থাকতে পারছি না, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও।

চিঠিটা পোস্ট করতে যাবো। এমন সময় দেখি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দোকানের কর্মচারী আবুল। ও রাহুলকে ডাকতে এসেছে। বাবা ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি ওকে বাড়ীর ভেতর ডেকে আনলাম। টিফিন্‌ক্যারিয়ার-এ করে খাবার সাজিয়ে দিলাম। ক্যারিয়ারটা ওর হাতে দিয়ে বললাম, বল্‌বি মঞ্জু পাঠিয়েছে। বলবি, মঞ্জুই রান্না করেছে।

আবুল চলে গেলো, আর ওর পেছন পেছন আমি রাস্তায় নামলাম। মোড়ের কাছে পোস্ট বাক্স।

চিঠি পোষ্ট করে আসছি এমন সময় পেছনে ডাক শুনলাম। শুনলাম আব চিনলাম! বেঙ্গু ডাকছে আমাকে। থামলাম না, ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করলো না। বাড়ীর গেটের কাছাকাছি এসে আবার জিজ্ঞেস করলো, কি রে কথার জবাব দিস না যে বড়!

কি জবাব দেবো?

কাকে চিঠি লিখলি?

বলতে হবে নাকি। আমার মুখ দিয়ে আপনা থেকে পাল্টা প্রশ্ন বেরিয়ে এলো।

না, না, আমার প্রশ্নে অপ্রস্তুত হলো যেন। বললো, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। ও হাসলো কৃতার্থ হয়ে।

আমি পা বাড়িয়েছি, গেট খুলে ভেতরে ঢুকবো। আবার সেই প্রশ্ন ওর। বলবি না, কাকে লিখলি?

আমার হাসি পেলো তখন। বললাম, প্রেম পত্রের কথা কি কেউ কাউকে বলে নাকি?

বেনু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। আমার সময় ছিলো না যে ওর দিকে তাকিয়ে দেখি।

বিকেলে মা খালার বাড়ী যাওয়ার জন্যে তৈরী হতে লাগলো। অন্যান্য বারের মতো আমাকেও যেতে হবে হয়তো।

এক সঙ্গে রিক্সায় উঠতে হবে, বসতে হবে পাশাপাশি, ভাবতেই বিশ্রী লাগলো। কিন্তু উপায় তো নেই। মম্ পুতুলকে সামলাবার লোক চাই। তা'ছাড়া কেমন করে একাকী থাকবো এতো বড় বাড়ীটাতে। বেনুদা আসতে পারে খাবাপ মতলব নিয়ে।

কিন্তু কি অবাক, মা আমাকে সঙ্গে নিলো না আজ। অবশ্যি স্বস্তি পেলাম। কিন্তু মা'ব মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে হলো, আজ কি হয়েছে যে, মা সঙ্গে নিলো না আমাকে। দেখলাম মা'র মুখ রাগে কালো হয়ে আছে। আমি যেন বিরাট কিছু অপবাধ কবে ফেলেছি। বুঝলাম আমার মা মরে গেছে। শুধু আমাব মা নয়। পুতুল মম্ ওরাও যেন হাবালো মা'কে।

এ বাড়ীটা কি বিচিত্র। ভাবা যায না কতো দ্রুত বদলে যাচ্ছে সব কিছু। এ ব'ড়ীব প্রতিটি মানুষ নিজের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কাবো সঙ্গে কারো মিল নেই। কেউ কাউকে বুঝতে চেষ্টা করছে না। কয়েকটা অদৃশ্য ফাটল বড় হতে হতে এখন প্রত্যেককে আলাদা করে দিয়েছে। এতো বড় একটা পরিবাবের মূল ধরে কেউ যেন নিষ্ঠুর হাতে টেনে ছিঁড়ছে টুকরো টুকরো করে।

ছোট আপা গেলো, আনিস গেলো, রাহুল গিয়েছে। আমি, আমিও তো নেই কারো সঙ্গে। আমবা সবাই একাকী।

কোথায যেন অদৃশ্য সূক্ষ্ম বাঁধন ছিলো। যা অনুভব করতাম সবাই। এখন আর তা কেউ অনুভব করি না। যদি করতাম, তা'হলে সবাই এমন করে দূরে দূরে চলে যেতে পারতাম না।

এই কি প্রেম! মা'র জীবনে এই কি প্রেম এসেছে। কবির

চাচাকে মা ভালোবেসেছে, বাবাকে ভালোবেসেছে, আর আকরামকেও ভালোবেসেছে।

এরই নাম যদি প্রেম হয়, তা'হলে জানি না, আমি কাউকে ভালোবেসেছি কিনা।

মেয়ের মন নিয়ে আমি বুঝতে পারি কেন মা কবিরের সঙ্গে অমন হাসাহাসি করতো, কেন আকরাম এসে মা'র শরীরে হাত রাখতে পারে। বুঝি এসব শরীরের বিচিত্র উল্লাস। মন যেন তখন আর নিজের কাছে থাকে না। সেই ভয়ঙ্কর উল্লাসের রূপ দেখে স্তব্ধ হয়ে যায়, অথবা সেই উল্লাসের তালে তাল দিতে থাকে।

এ যদি প্রেম না হয় তাহলে এর নাম কি? আর কেন ভালো লাগে এসব। মা'র তো কতো আছে সাধের আশ্রয়। স্বামী আছে, সন্তান আছে, সংসার আছে তবু কেন মা এই বিচিত্র উল্লাসে গা-ভাসিয়ে দিতে চায়। কেন মা'র ভালো লাগে এ সব।

আমি আর পারি না এমন ভাবনা নিয়ে।

বিকেলের দিকে বেনু আসে নি। বিকেলটা কাটলো বেশ একা'কী।

আমাকে যেতে হবে। এ বাড়ী ছেড়ে যাওয়া ছাড়া আমার কোন উপায় নেই এখন আর। যদি চাচা আসে কা'ল অথবা পরশু অথবা পরের সপ্তাহে কোনদিন, তা'হলে বাঁচি। একেকটা দিন যাচ্ছে, আর মনে হচ্ছে একেকটা দীর্ঘ আর ক্লান্ত বছর কাটছে। এ বাড়ী থেকে চলে গেলেও কি বাঁচবো আমি? মনের মধ্যে প্রশ্নের মুখোমুখি পড়তে হয় আমাকে।

দাদুর বাড়ী গিয়ে উঠবো। তারপর কয়েক দিন পর আমার বিয়ে হয়ে যাবে। আমার বাধা দেবার শক্তি থাকবে না। আর কোন দিন আমি সেই সুখের স্পর্শ পাবো না, যে সুখে আমার সারা মন বিভোর হয়ে রয়েছে। আমি যে সমুদ্রের মুক্তি পেয়েছি সারা মনে তা আর কোনদিন অনুভব করবো না। সেই সুখ, সেই মুক্তি ধরে থাকতে হ'লে আমাকে শক্ত পায়ে দাঁড়াতে হবে।

কিন্তু দাঁড়াবো কোথায়! আমার পায়ের নিচের জমিই যে টলোমলো। আমি কার আশ্রয়ে থাকবো এখানে। বাবা নেই, আনিস নেই, মা নিজেই থাকবার অধিকার হারিয়েছে। এখন কোন আশ্রয়ের নিচে আমি মাথা গুঁজবো।

আজকের সন্ধ্যা একাকী। উঠোনে একাকী হেঁটে বেড়ালাম, মনের ভেতরে এলোমেলো ভাবনা নিয়ে। হাওয়া বইলো, তারা দেখা গেলো আকাশে, তারপর আবার হয়তো হাওয়া চুপ করে গেলো, মেঘ ভেসে এলো। আবার হয়তো হাওয়া দিলো, বইলো অন্য কোথাও, তারা ফুটলো অন্য কোন আকাশে। আমার হাতে একটা সন্ধ্যা হঠাৎ এসে গিয়েছে। যে সন্ধ্যায় আমার কিছুই করবার নেই। যদি আমার বন্ধুরা কেউ আসতো, রঞ্জু কিম্বা নাসিমা তা'হলে ওদের সঙ্গে গল্প করা যেতো। যদি রাহুলও থাকতো। আর যদি, যদি থাকতো....। আমার মন এই নিঃসঙ্গ একাকী সন্ধ্যায় ওর কথা স্মরণ করতেই থমকে উঠলো।

ও যদি থাকতো তাহলে কি হতো বলা যায় না। ইশ, কি ভয়ঙ্কর সুন্দর আর লোভের সন্ধ্যা হতো এটা।

বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যা হয়ে ছিলো, এখন সন্ধ্যা ফুরিয়ে রাত্রি। আর সেই প্রথম রাতেই নিঃসঙ্গ মস্ত বাড়ীটার দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

কে! সাড়া দিলাম আমি।

আমি, মোহনপুর থেকে আসছি।

মোহনপুর! আমার দাদুর ওখান থেকে! আমি ছুটে গিয়ে দরজা খুললাম।

চৌধুরী সাহেব আছেন? এক অপরিচিত ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

না, মাথা নাড়লাম আমি। ভদ্রলোককে চিনতে চেষ্টা করলাম।

ওঁকে একটা কথা জানাবেন?

বলুন।

বলবেন, মোহনপুরের হাফিজ খান মারা গেছেন।

মারা গেছেন! অস্ফুট স্বর বেরুলো আমার কণ্ঠ দিয়ে। ঠিক বুঝতে পারলাম না কি হলো আমার। মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত চেতনা যেন অসাড় হয়ে গেলো। ভদ্রলোককে আমি দেখতে পর্যন্ত পেলাম না।

না কান্না, না যন্ত্রণা, না দুঃখ—কিচ্ছু না। শুধু একটা প্রকাণ্ড শূন্যতায় ভবে গেলো সমস্ত মন।

দাদু নেই! শুধু এই শব্দ দুটো যেন চারপাশ থেকে মৃদু স্বরে আমার কানের কাছে বলছে কেউ বারবার। আমাকে শুনতে হচ্ছে সেই কথা। আমার শুনতে ইচ্ছে করছে না তবু শুনতে হচ্ছে।

কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছি জানি না। যখন সম্বিত ফিরলো, দেখলাম ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চলে গিয়েছেন। দরজার কপাট ধরে আমি একা।

আমি একা! এই প্রকাণ্ড প্রাচীন বাড়ীর উঠোন, দূরের বারান্দা, দোতলার ঘরগুলো, সব জায়গায় যেন একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা আর তার মাঝে আমি একা।

দাদু নেই। এই সেদিনও ছিলেন। মুখে প্রসন্ন হাসি আর স্নিগ্ধতা দেখেছি। পাতলা ধবধবে ফর্শা মানুষ, মুখে সাদা দাড়ি আর সেই দাড়ির আড়ালে স্নিগ্ধ হাসিটি। কাছে দাঁড়ালে মাথা নিচু হয়ে আসতো। এই সেদিন এলেন, এসে বলে গেলেন, চল তুই এবার, তোর জন্যে ভালো বর জুটিয়েছি। যাবার সময় হাতে ক'টা টাকা দিয়ে গেলেন, আর সেই সঙ্গে হাতে ক'গাছি চুড়ি। বললেন, হাত খালি রাখিস কেন?

শুধু কি সেদিনই। আমাকে অনেক জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন দাদু। আমি তাঁর বড় ছেলের সন্তান। আমার আদর ছিলো সব চাইতে বেশি।

তাঁর সঙ্গে ঢাকা গিয়েছি, পাবনা গিয়েছি, কলকাতা গিয়েছি। মাঝে মাঝে শুধু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর বলতেন, আজ যদি তোর বাবা বেঁচে থাকতো। আমি দেখতাম তার দু'চোখ পানিতে টলমল আর ঝাপ্সা হয়ে উঠতো।

দাদু নেই। আর আসবে না কোনদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে। কখনো তাঁর শক্ত আর বিশাল হাতখানা আমার মাথা আর কাঁধ ছুঁয়ে আশীর্বাদ করবে না।

সেই সন্ধ্যায় আমি একাকী থাকলাম। নিজের ঘরের বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে। না, কাঁদছিলাম না; ভাবছিলাম। এবং একটু পর বাবার গলা শুনলাম। বাড়ীতে ঢুকেই রাহুলকে ডাকলেন। তার পর এঘর-ওঘর খুঁজে এসে দাঁড়ালেন আমার ঘরে। আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, আজই কি যাবি তোর দাদুর ওখানে?

না, মাথা নেড়ে বললাম আমি।

কাল সকালে রওয়ানা দে তাহলে।

না, আমি যাবো না। আমি আরেক বার বললাম।

বাবা দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। আমার মনে হলো বাবা যেন কিছু দেবার জন্যে এসেছেন। বাবার কাছে যেন কিছু আছে, যা আমি না পেলে চিরকালের জন্য আমি নিঃস্ব হয়ে যাবো। মনোময় ছাওয়া সেই শূন্যতার ওপার থেকে আমার ডাকতে ইচ্ছে করলো বাবাকে। ডাকলাম, বাবা!

বাবা কাছে এলেন। আর সেই মুহূর্তে কেঁদে ফেললাম। বাবার সস্নেহ সান্ত্বনার হাত আমাকে শান্ত করলো। বললেন, কাঁদিস না মা, কেউ তো চিরদিন বাঁচে না।

একটু পর আবার বলেছিলেন বাবা, কাল যাবি?

না, কি হবে যেয়ে!

তা' বটে, বাবাই বলছেন তখন। ওখানে গিয়ে আরো কষ্ট পাবি।

মা সেদিন কখন ফিরেছিলেন জানি না। বাবা কখন দোকানে ফিরে গিয়েছিলেন তাও জানি না। আমি সেদিন সারাটা রাত জেগেছিলাম।

এই দুঃখের মধ্যেও বাবার সস্নেহ সান্ত্বনা মনের ভেতরে কি যেন পরম প্রাপ্তির স্বাদ এনে দিয়েছিলো। এই স্বাদ আমি মনে মনে অনুভব

করছিলাম। না, আর অন্য কোন কথা ভাবতে পারি নি, পরশু আর কালকের দু'টো দিন। না তাকিয়েছি মা'র দিকে, না রাহুলের দিকে। লক্ষ্য করিনি কখন এসেছে বেনু, কখন ফিরে গেছে আকরাম। একবার শুধু মনে হয়েছে রাহুল যেন আড়াল থেকে দেখে গিয়েছে আমাকে। কিন্তু মুখোমুখি দাঁড়ায় নি। কেন না কাম্মাকে বড় ভয় ওর। সহানুভূতির কথা খোলাখুলি ও কাউকে বলতে পারে না। আমার এই দুঃখের দিনে জানি রাহুলই আমার ভাই, আমার বন্ধু।

সেদিন ভোর রাতে আমি আনিসের কথা ভাবছিলাম। মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম, হে বিধাতা, আনিস যেন না আসে। আমার কষ্টের দিনে ও আমার কথা নিয়ে চিন্তা করবে, তারপর যখন দেখবে আব্বা বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছেন তখন ও ভেঙে পড়বে। বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে হয়তো নিজেরই ওপর থেকে।

আমি এখন একাকী। দাদু মা'রা যাবার পর আরো বেশী একাকী লাগছে নিজেকে। আমার মন ছেয়ে যে শূন্যতা নেমেছিলো তা যেন কাটছে না কোনমতেই। কাটতো হয়তো। যদি বাবা আসতেন বাড়ীতে রোজ, যদি রাহুলের সঙ্গে আগের মতো স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে পারতাম। কিন্তু ওরা কেউ আসে না। আর যদি বা আসে, কখন যে চলে যায় টেরও পাই না। প্রকাণ্ড বাড়ীটা এখন সারাদিন খাঁ খাঁ করে। ওপর তলার ফাঁকা ঘরগুলোর ওপর দিয়ে শোঁ শোঁ হাওয়া বয়ে যায়। মাঝে মাঝে হাওয়ার ঝাপটায় দরজা-জানালাগুলো আছাড় খায়। সেই শব্দ কেঁপে কেঁপে নামে দেয়াল বেয়ে নিচুতলা পর্যন্ত।

কি যেন একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক চেপে ধরেছে এতোবড় বাড়ীটাকে। সেই ভয়ঙ্কর আশঙ্কা বুকে চেপে আছে আমার। ঠাণ্ডা পাথরের মতো। মম পুতুল পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে কথা বলছে না। কি যে হয়েছে কেউ জানে

না। এখন এক একটা দিন তো নয়, যেন এক একটা যন্ত্রণার যুগ। সেই নিঃস্ব ঠাণ্ডা নিঃস্তব্ধতার পাহাড়ে মাঝে মাঝে আকরাম কিংবা মায়ের হাসি মৃদু শব্দ করে হারিয়ে যায়।

আর আছে বেনু। বারবার আসে ও। এসে দাঁড়াতে চায় আমার সম্মুখে। মা এই নিয়ে কি যেন দু' একটা কথাও বলে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কোন সময়েই আমি কাছাকাছি যেতে পারি না। স্বাভাবিক হতে পারি না।

চৌধুরী বাড়ীর ভেতরকার সাংসারিক কাজ মন্থর স্রোতের মতো আপন নিয়মে বয়ে চলেছে। আমাকেই সব কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু ভুলতে পারি না সেই অস্বস্তিকে, সেই আতঙ্ককে। যেটা প্রবল শক্তিতে বাড়ীটাকে চারপাশ থেকে অষ্টবাহু জড়িয়ে চেপে ধরেছে নিষ্ঠুর ভাবে। কিছু যেন হবে, কিছু যেন হবে।

কী যে হবে কেউ জানে না। তবু সবাই সন্ত্রস্ত। সবাই ভয়ে ভয়ে পা ফেলে। সবাই সবাইকে এড়িয়ে চলতে চায়। মম পুতুল পর্যন্ত আজকাল হাসতে পারে না। ছুটোছুটি করতে পারে না। আকরামের চলা-ফেরায় পর্যন্ত একটা সন্ত্রস্ত ভাব। বেনুদা পর্যন্ত উঁচু গলায় কথা বলতে সাহস করে না। শুধু চোখ মেলে তাকায়। সে চোখের ভেতরে কুটিল ঈর্ষা না উন্মুখ যন্ত্রণা বুঝতে পারি না। শুধু কালো একটা ছায়া যেন চোখের ভেতরে বুনো অন্ধকারের মতো থমকে আছে।

আমাকে পালাতে হবে, এ বাড়ী থেকে পালাতে হবে। নইলে আমি বাঁচবো না। দু'দিন আগে চিঠি লিখেছি আরো একটা। চাচা এলেই আমি চলে যাবো, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে। আর একটা কাজ করেছি। জানি না, ঠিক করেছি, না ভুল। আনিসকে চিঠি লিখেছি। না লিখে পারি নি। আমার সব কথা বলিনি। কিন্তু কিছুটা না জানিয়েও শান্তি পাচ্ছিলাম না। ও যদি আসতো একবার! আমাকে বলতে পারতো, আমি কি করবো।

আজ সাত দিন হলো বাবা বাড়িতে আসছেন না।

হলো না। এ-বাড়ী ছেড়ে যাওয়া আমার হলো না। বুঝেছি আমাকে মরতে হবে এদের সঙ্গে। এই বাড়ীর মূল শিকড়ের সঙ্গে বোধ হয় আমিও জড়িয়ে গিয়েছি। আর নিশ্চিত প্রলয়ের দিনে আমাকে সুদ্ধ পড়তে হবে এদের সঙ্গে একই ধ্বংস-স্তূপে। কিংবা ভেসেছি এদেরই সঙ্গে একই ভাঙা ভেলায় কোন সর্বনাশা স্রোতে যার শেষে রয়েছে অতল প্রপাত। কোন পথ নেই আর।

চাচা চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন। আমি ওদের বাড়ীর কেউ নই। ওঁরা আমার কোন রকম দায়িত্ব নেবেন না। আর আইনতঃ আমি ও বাড়ীর কিছু পাই না।

আমি জানি চাচা কেন এ সব লিখেছেন। ব্যবসায়ী মানুষ চাচা, শুধু ব্যবসায়ী নন, জোতদারও। জমিজমা করেছেন অনেক। জমিজমা বাড়াবার কায়দা কৌশল তাঁর ভালো করে জানা আছে। ব্যবসায়ী বুদ্ধি যদি এখন না বেরুবে তাহলে আর কখন বেরুবে! দাদু যে সম্পত্তিটুকু আমার নামে লিখে দিয়েছেন সেটুকু এখন হাতছাড়া করতে চান না। আমি ও বাড়ীতে থাকলে অসুবিধা হবে। তাই মিছিমিছি ঝামেলা বাড়াতে নারাজ তিনি।

সে দলিল যে রেজেস্ট্রী হয়েছে, তা প্রমাণ করে, জমি দখল করতে তো আবার মামলা মোকদ্দমার দরকার। সেই মামলা মোকদ্দমা করার মতো ক্ষমতা হবে না আমার, সেই ভরসাতেই উনি বাড়ীতে নিয়ে ঝামেলা বাড়াতে চান না।

আমি জানতাম, এ রকম হবে। দাদু যেদিন মারা গিয়েছেন, সেদিন থেকেই আমার নিজের বাড়ীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গিয়েছে।

এরই নাম কি নিয়তি?

বারবার আমি বেঁচে থাকার জন্যে আকুল হাত বাড়িয়েছি আর বারবার ব্যর্থ হয়েছি। বারবার আঘাত এসে আমাকে হতাশার দিকে ঠেলে দিয়েছে। আমার সব সুখ, সব সাধ, এমনি করে ব্যর্থ হয়েছে একের পর এক।

এখন আমি শূন্য। মা আমার মা নয়। বাবার দিক থেকে কোন সম্পর্ক থাকলো না। আমার এখন দাঁড়াবার জায়গা নেই এতোটুকু। অথচ সব তো ছিলো আমার। সব ছিলো নিজের, যেখানে আমার চিরকালের দাবী রয়েছে। এখন সেই দাবী থেকেও নেই। দাবী করবার সব শক্তি ফুরিয়েছে আমার। এবার শুধুই ভেসে চলা দিকচিহ্নহীন অনির্দেশের দিকে।

তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠবে। আমার জীবনকে মনে হয়েছে গভীর সমুদ্রের মতো। যার তরঙ্গ ওঠে ঝড়ে, স্রোতের আলোড়নে।

অথচ মঞ্জুকে সেদিন কতো গভীর মনে হয়েছিলো আমার।

ফুল ফোটানোর পালা কবে যে ফুরোবে, কে জানে। বদলে যাচ্ছে বাইরের মাটি, আকাশ, গাছপালা আর সেই সঙ্গে মানুষের মন। কে জানে আমিও হয়তো বদলে যাবো। বদলাবে আনিসও।

সেদিন পথ হাঁটতে হাঁটতে ফিরছিলাম, কিন্তু পথ যেন ফুরোতে চাইছিলো না আমার। আকাশের দিকে বারবার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিলো।

হায় হায় কি আশ্চর্যের কথা। মীনার বিয়ে হয়ে গেলো। হ্যাঁ, ঢাকাতেই বিয়ে হলো। ছোটখালা খবরটা জানিয়ে গেলো মা'র কাছে। আমি শুনলাম। তারপর সরে আসবার সময় আরেকটা কথা শুনলাম। খালা বলছে মা'কে, মঞ্জুকেও বিদায় কর এবার।

জানতাম ছোটখালা এ কথা বলবে। এখন তো আর কোন অসুবিধা নেই মা'র। বাধা নেই, মা'কে কেউ বাধা দিতে আসবে না।

এ সব কথা আজকাল আর ভাবি না আমি। বেনুকে ভয় করি না আর। জানি মুখোমুখি দাঁড়ালে বেনু কাপুরুষের মতো মাথা নীচু করবে। চলে যাবে। ওর এখন সাহস নেই।

কেন নেই জানি না। তবে নেই যে বুঝতে পারি। এখন

কাউকে ভয় করে না আমার। আমার সব যন্ত্রণা সব কান্না যেন শেষ হয়ে গেছে। ঝড়ের পর যে শান্তি নামে, সেই শান্তি এখন আমার মনের ভেতরে আর বাইরে। আমার করবার কিছু নেই, ভাববার কিছু নেই। এখন চারটা দেয়াল আমার সীমানা। বাইরের খবর জানি না। কিন্তু তবু যেন বুঝতে পারি, শুধু আমি একা নই। সবারই ভিত্তি টলে গেছে তলে তলে। সবাই ভাসছে সেই বিপজ্জনক স্রোতে। আমাদেরই চারপাশে কোথায় যেন রয়েছে সেই স্রোতের উৎস। আমরা তা ধরতে পারছি না। দিন আর রাত্রির অসংখ্য মুহূর্তগুলোর মধ্যে আমরাই ভেসে চলছি আর সেই ধ্বংস-স্রোতকে বেগবান করছি।

সেই স্রোতের উৎস কে। কেউ জানে না, বলতে পারে না। কিন্তু বুঝতে পারি, সে রয়েছে আমাদের চারপাশে। আর সবাই মিলে আমরাই সর্বনাশা স্রোতটাকে জোয়ারের মতো ফুলিয়ে তুলেছি। এখন আর রুখবার ক্ষমতা নেই কারো।

চৌধুরী বাড়ী ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই ধ্বংসের সূচনা যে আরম্ভ হয়েছে সেও তো নিশ্চিত নিয়মেই। একটা একটা করে ইঁট খসে যাচ্ছে, দেখছে সবাই, কিন্তু কেউ বাধা দেবার নেই এই ধ্বংসের মুখে। অসংখ্য সূক্ষ্ম কীট যেন কুরে কুরে খাচ্ছে বিরাট একটা মহীরুহের শিকড়গুলোকে।

বুঝতে পারি ছোট আপার এমনি চলে যাওয়া, বাবার এমনি বাড়ী না আসা, কিংবা মা'র এই বিশ্রী উন্মাদনা, রাহুলের অব্যক্ত যন্ত্রণা, আনিসের অস্থিরতা—সব কিছুর অন্তরালে রয়েছে সেই ধ্বংসের কীট যা কাজ করে চলেছে আপন নিয়মে। বেনুদা, আকরাম এদেরও সেই কীট খেয়ে খেয়ে বিষাক্ত করে রেখেছে।

বুঝতে পারি, মাঝে মাঝে শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছি আমি, রাহুল, আনিস, বাবা। কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাবে আমরা তো ক্ষুদ্র। নিজেদেরই যে আমরা ভালো করে চিনি না। যদি সবাইকে

ভালোবাসতাম, সংহত করতাম নিজেদের। সহজ হতাম, স্বাভাবিক হতাম—তাহলে হয়তো দাঁড়াতে পারতাম এই ধ্বংসের স্রোতের মাঝখানেও দ্বীপের মতো। কিন্তু নিজেরা পরস্পরকে জানলাম না যে।

সোনা আর সোনা। রূপো আর রূপো? আর সেই সোনা রূপো মিলিয়ে শক্তি আর সম্মান। শক্তি আর সম্মানের দিকে হাত বাড়িয়ে রেখেছি আমরা। সেই লোভী হাত ফেরাতে পারি না বলেই আমরা সন্দেহ সংশয় লোভ আর ঘৃণার কুটিল আবর্তে পড়েছি। বেনু আর আকরাম যেন সেই আবর্তের তলায় ডুবো মৃত প্রেতাত্মা। সোনা রূপোর জগতে যে উল্লাস রয়েছে সেই উল্লাসকে পেতে চেয়েছে ওরা সারা জীবনে আর জীবনকে বিক্রি করে হয়েছে সেই লোভের ক্রীতদাস।

মা'রও লোভ ছিলো। এ লোভ সোনা রূপো পাওয়ার জন্যে হাত বাড়ানো নয়। মার লোভ ছিলো রক্তে মাংসে। লোভের পৃথিবীতে একটা উল্লাস রয়েছে। মা জীবনে পেতে চেয়েছিলো সেই উল্লাস। আর আজীবন সেই উল্লাসের ক্রীতদাসী হয়েছে মা। নিজের জীবন দিয়ে কিনেছে এমনি একটা শিকল। এখন উল্লাসের সেই অভ্যাস তাকে টেনে নামিয়েছে ঘৃণা আর লোভের তরঙ্গিত সমুদ্রে। যেখান থেকে মা আর কোনদিন উঠতে পারবে না।

আমি জানি না, আমার ভাবনায় কোন ভুল আছে কি না। কেন না বিশ্বাস করতে পারি না কোন কিছুর ওপর। চারদিকেই যে সংশয়, চারদিকেই যে সংকট। স্থির নিশ্চয়তার কথা কেউ বলতে পারে না। কেউ না।

বহুদিন পর কাল রঞ্জু এসেছিলো। সঙ্গে এসেছিলো তাজিনা। ছোট খালার ভাসুরের মেয়ে।

মীনার কথা জিজ্ঞেস করলাম ওর কাছে।

তাজিনা চুপ করে গেলো। বোধ হয় গম্ভীর হল, আমি ঠিক বুঝলাম না। খানিকটা বোকার মতো থেকে অন্য কথায় ফিরে এলাম। কিন্তু সেই কৌতূহলটা জেগেই রইলো।

তারপর উঠলো নাসিমার কথা। ওর কথা উঠতেই তাজিনা হেসে কুটিকুটি।

কি হলো ? আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

কি বেহায়া মেয়ে রে বাবা। রঞ্জু হেসে ফেললো। বললো, জানিস না তুই কি ব্যাপার হয়েছে ইতিমধ্যে। আহসান আর ও এক রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। অনেক রাতে বাড়িতে ফিরে আসাব সময় নাসিমা ওর বাবার মুখোমুখি পড়ে। ওর বাবা ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। রেগে ছিলেন খুব। আহসান কিছু বলার আগেই মেয়েটা কি বোকা, বলে ফেললো, বাবা আমি আহসানকে বিয়ে করবো। ওর সঙ্গেই বাইরে ছিলাম এতোক্ষণ। এ পর্যন্ত বলেই রঞ্জু মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে উঠলো খিলখিল করে।

বারে। এতে হাসবার কি হয়েছে। আমি অবাক হলাম, ঠিক কথাই তো বলেছে।

তাই নাকি কেউ করে। একটু লজ্জা করলো না, এমন বোকামী কেউ করে ?

তাজিনাও হাসলে। ভয়ানক বোকা মেয়েটা। একটা মেয়ের জীবনে কতো কিছু হয়ে যেতে পারে। সে সব কথা কি সব খুলে বলতে হয় !

বলবে না তো, জানবে কেমন করে ! এ তো ভারি মজার। সবাই কি অন্তর্যামী নাকি ! আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না।

হুঁ, তোমার ঐ বুদ্ধি নিয়ে থাকো তুমি। আমি বলেছিলাম, তুমি ঠকবে ভীষণ ঠকবে।

(কতো মেয়ে কতোজনের সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে কত জায়গায়, টাকা পয়সা রোজগার করছে তাই নিয়ে—সব বুঝি বলে বেড়াতে হবে।)

তাহলেই তো চিত্তির। সে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না আর।

এ সব কী বলছো তোমরা ! আমার তখন বিমূঢ় অবস্থা।

বাঃ রে মেয়ে, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানো না, কচি খুকী!

আমি চুপ করে শুনলাম। তাজিনা নিজের কাপড়-গয়না দেখিয়ে বললো, আমার বাবার না হয় টাকা-পয়সা আছে। আমি এ সব পারি। কিন্তু জোহরা হাস্না ওরা যে এ ধরনের কাপড়-জামা পরে—কোথায় পায়। বাপ তো কেরানী। কোথায় পায় শুনি?

কেন, ওর মাসুদ ভাই, নিজাম ভাইরা, অসীমদা'রা! ওরাই সব প্রেজেন্ট করে! রঞ্জু হাসতে হাসতে বললো।

তা বেশ তো, প্রেজেন্ট করতে পারে তো, আমি এবারও না বলে পারলাম না।

আরে বোকা, শুধু শুধু প্রেজেন্ট করবে কেন, কথা নেই বার্তা নেই একশো দেড়শো টাকার জিনিস প্রেজেন্ট করে বসবে। তার জন্যে কিছু দিতে হয় ওদের নিশ্চয়ই। রূপ আর যৌবন ছাড়া আর কি আছে ওদের। তুই তো বেরোস না। একবার যদি বেরিয়ে দেখতিস বাইরের দুনিয়াটা।

ওসব কথা শুনলে আগে হয়তো কানে আঙুল দিতে হতো, কিন্তু ঠিক এ রকম না হলেও এ ধরনের ঘটনা তো আমি বাড়ির ভেতরেই দেখছি। আমি চুপচাপ শুনলাম ওদের বিস্ময় আর রোমাঞ্চের গল্পগুলো।

তবে একটা গল্প বলি শোন, তাজিনা বললো। আমার সঙ্গে পড়ে জাহানারাকে চেনো তো, খুব সুন্দর দেখতে, চমৎকার স্বাস্থ্য। তাকে নিয়েই ঘটনা।

হঠাৎ একদিন কলেজ ছুটির পর শুনলাম, শেলীর জন্মদিন। শেলীকে মনে নেই! কয়েক বছর ধরে যে কলেজ ছাড়ছে না। ওদের বাড়িতে পার্টি। ক্লাশের সব মেয়েদেরই নিমন্ত্রণ।

সন্ধ্যার দিকে সবাই গেলাম। আলাপ হলো শেলার এক খালাতো ভাইয়ের সঙ্গে। ওমা, ওর খালাতো ভাইটা সব সময় জাহানারার কাছে কাছে থাকলো! এদিকে জাহানারা খুব বিরক্ত হলো, কিছু বলতেও পারে না: টেবলের ওপর অনেকগুলো উপহারের বই ছিলো।

জাহানারা একখানা দেখে পছন্দ করলো। শেলীকে বললো, ভাই একখানা যাওয়ার সময় নিয়ে যাবো, পরে ফেরত দেবো।

সবাই আমরা যে যার মনে আছি। এক সময় লক্ষ্য করলাম জাহানারা কোথা থেকে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। সারা মুখ টকটকে লাল, রাগে না উত্তেজনায় ঠিক বোঝা গেলো না।

সেদিন ফিরতি পথে এক রিক্সায় দু'জনে আসছিলাম। ওর হাত থেকে বইটা দেখার জন্যে নিয়ে খুলতেই দেখি, ওমা, একখানা একশো টাকার নোট। কী করে এলো, জাহানারার মুখ তখন কালো হয়ে গেছে। কাঁদো কাঁদো গলার বলল, আমি কিছু জানি না, বিশ্বাস কর।

বাসায় ফিরে তক্ষুণি ছোট ভাইকে দিয়ে বইখানা ফেরত পাঠালো, শেলীর খালাতো ভাই বখতিয়ার খানের কাছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য জানিস। বখতিয়ার খান অস্বীকার করে বসলো ও টাকা আমার নয়।

এটাই হলো কায়দা। জানা গেল কে দিয়েছে টাকা। কিন্তু সে টাকা ফেরত দেয়া গেলো না। তার ঠিক দু'দিন পরই জাহানারাদের বাড়িতে বখতিয়ারকে দেখা গেলো। তারপর দু'তিন সেট নেকলেশ দেখলাম পর পর জাহানারার গলায়।

রঞ্জু এক সময় বললো, কিচ্ছু জানতাম না রে মঞ্জু। ভারী মজার মজার ব্যাপার ঘটে সব। এমনি কতো ব্যাপার হয় আজকাল। তুই ভাবতেও পারবি না। শুনলে বিশ্বাস হবে না তোর।

ওর কথা শেষ হবার আগেই আমি ওর মুখ চেপে ধরলাম। বললাম, থাক রঞ্জু। আর কত নোংরা কথা শুনবো। দু'একটা ভাল কথা শোনা।

কিন্তু ভালো কী শোনাবে ওরা। মেয়েদের, বিশেষ করে ওদের মতো বয়সের মেয়েদের যে কৌতূহল, সে কৌতূহলের মধ্যে তো আর অন্য কোন কথা খুঁজে পায় না ওরা। ওদের চারপাশে যে অমনি একটা নগ্ন মত্ততা ফুলে ফেঁপে উঠছে।

ওরা চলে গেলে বিরক্ত হলাম নিজেরই ওপর। কেন ওদের কথা শুনলাম! কী লাভ এতে। এখন তো বিশ্রী লাগছে নিজেকেই। কেন না বুঝছিলাম, তাজিনা কিংবা রঞ্জু ওদেরও যেন কোথায় একটা অভিজ্ঞতা আছে। আমার চেয়ে আলাদা ওরা এ সব ব্যাপারে। হ্যাঁ একেবারে আলাদা। তাহলে কি আমিও ওদের সবার মতো হয়ে যাকো, টাকা-পয়সার জন্যে আমিও....

আর কল্পনা করতে পারি না। ভয়ে, আতঙ্কে, ঘৃণায় সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে। আমি, কেন জানি না, সেদিন ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

দমকের পর দমক কান্না আমার বুক ঠেলে উঠে আসতে লাগলো। আমার কান্না শুনে ছুটে এলো মা, ওদিক থেকে রাহুল। ওরা আমাকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লো। বারবার ডাকলো, এই মঞ্জু, কি হয়েছে? কি হয়েছে?

কিছুক্ষণ পর আমার কান্না থেমে গেলো। বললাম পেটে ভয়ানক কামড়াচ্ছিল।

আমাকে একটা হাস্যকর মিথ্যা কথা বলতে হলো। না বলে যে উপায় ছিলো না।

একেকবার মনে হয়েছে, আমিই কি তবে অস্বাভাবিক, আর সবার থেকে আলাদা? সবারই তো জীবনের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা থাকে। সবারই জীবনে দেখছি, কেবল আমারই নেই। আমার এতো বিশ্রী লাগে সমস্ত ব্যাপার। তাহলে কি আমারই ভেতরে রয়েছে কোন জটিলতা যার জন্যে আমি ভয় পাই, ঘৃণা করি। না আমার মনে এটা একটা বহু যুগের পুরনো কোন কুসংস্কার বাসা বেঁধে রয়েছে। যা থেকে আমি মুক্ত হতে পারছি না। অথচ ওরা কতো সহজ আর স্বাভাবিক।

আমার নিজেরই ওপরকার বিশ্বাসগুলো টলমল করতে থাকে। আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম মাকে। মা মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে, কি রে কি দেখছিস?

মার চেহারার মধ্যে যেন কোথাও একটি তৃপ্তির আভাস দেখা যায়। শরীরের উজ্জ্বলতা বেড়েছে। চোখ দুটোতে কি যেন ভরে এসেছে। বেশ লাগে মাকে দেখতে—খুব সুন্দর মনে হয়।

আমি দেখি আর অবাক হই। মা কতো স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে। সেই আগের মতো। কিন্তু পারে না। ঠিক পারে না কি? আবার আমারই মনের ভেতরে সন্দেহ দুলিয়ে ওঠে। মা ঠিকই আছে, আগের মতোই সহজ আর স্বাভাবিক। আমি হযতো বদলেছি আর অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছি। যদি আমি ওদের একজনের মতো হতাম, তা'হলে হযতো মাকে আমার চোখেও স্বাভাবিক লাগতো।

আমি আর চিন্তা করতে পারি না। এ কী বিশ্রী কৌতূহল আমার। নিজেরই ওপর বিরক্তি ধরে একেক সময়। আমিই কি বিকৃত হয়ে যাচ্ছি না মনে মনে! কেন কি দরকার এতোবার করে এ সব কথা ভেবে! এ সব কথা চিন্তা করে!

এসব ভাবনা একেবারে বাদ দিলেই তো পারি। এ-ছাড়াও তো জীবন অনেক বড়। জীবনের কতো রকমের দিক আছে।

আমার এই হয়েছে মুশকিল। চারটে দেয়ালের বাইরে যেতে পারি না। যারা বাইরে থেকে আসে, তাদের কাছ থেকে যে খবরগুলো পাই সেগুলো একই ধরনের।

সেদিন ছোট খালা এলো। মা'র সঙ্গে আলাপ করতে করতে বললো, মীনাকে ওর ফুফুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

কেন?

একটু পড়াশোনা করুক। আর কি একটা অসুখ হয়েছে তারও চিকিৎসা হবে।

বিকেলে একটু পরই রঞ্জু এলো। সে খবর শুনে বললো, আরে চিকিৎসার জন্যেই যাচ্ছে। ঠিকই বলেছে তোর ছোট খালা।

বুঝলাম, সেদিন মীনার সম্বন্ধে এ কথা বলতে গিয়েছিলো বলেই

তাকিনা চুপ করে গিয়েছিলো। রঞ্জু সেদিনের মতোই যেন কী একটা কথা বলতে এসেছে বুঝলাম। সেদিন আমাকে একাকী পায়নি বলে সে কথা না বলেই চলে গিয়েছিলো।

পাশাপাশি বসে অনেকক্ষণ পর বললো, দেখ মঞ্জু. আমি বোধহয় সুখী হতে পারবো না রে।

আমি অবাক হলাম, হঠাৎ ক'দিনেই মত বদলে ফেললি ? কেন কি হয়েছে ?

না, কিছু হয়নি। ও আকাশের দিকে তাকালো, মনে হচ্ছে ও যেন আলাদা। চিন্তায় ভাবনায়, কাজে কর্মে এমন কি প্রকৃতির দিক থেকেও আলাদা। আজকাল আমাকে সন্দেহ করে। বাড়িতে শফিক ভাই আসে আর সেই নিয়ে ওর যতো বাজে সন্দেহ।

আমি কিছুই বললাম না। এ সব ঘটনা আর কতো শুনবো। এখন আমার ক্লান্তি লাগে।

রঞ্জু খানিক পর উঠে চলে গেলো। বললো, মানুষের মন এতো জটিল মঞ্জু. বোঝা ভয়ানক শক্ত।

তুই কি জানতিস না ?

জানতাম, কিন্তু অনুভব করতে পারিনি। তখন কতো ছেলেমানুষ মনে হতো ওকে। কেমন সুন্দর হাসতো, অভিমান করতো। আমার একটা কথার জন্যে দিনরাত ভাবতো।

কিন্তু এখনও কেবলই সন্দেহ করে। কী যেন দেখতে চায় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ! কাল কি বলে গেলো জানিস ? বলে গেলো, আমি যেন শফিকের সঙ্গে কথা না বলি।

একটু পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, মনটা এতো ছোট হয়ে যাচ্ছে ওর। আমারই লজ্জা করছিলো ওর সঙ্গে কথা বলতে।

ভুল করেছি আমিই। যদি আমি নিজেকে ওর হাতে ছেড়ে না দিতাম। যদি এড়িয়ে যেতে পারতাম, তাহলে হয়তো ওর কাছে এতো সহজে মূল্য হারাতাম না। আমার যেন এখন আর কোন আকর্ষণ

নেই। যে পিপাসায ওকে আর্ত হয়ে উঠতে দেখেছি সে পিপাসা মিটেছে, এখন ও নিস্পৃহ। আমার কিছুই গোপন নেই ওর কাছে। যদি কিছু গোপন রাখতাম।

রঞ্জু দীর্ঘশ্বাস গোপন করলো।

তুই অমন ভুল করবি না মঞ্জু।

আমার হাসি পেলো সেই মুহূর্তে। কিন্তু হাসলাম না। বললাম, নিশ্চিন্ত থাক তুই, প্রেম করতে যাচ্ছি না আমি। আর সে জন্যে ওসব চিন্তাও আমার আসবে না কোনোদিন।

রঞ্জু আমার দিকে চোখ রাখলো। আমার মুখ থেকে দৃষ্টি নামালো বুকে, তারপর তারও নিচে, একেবারে পা পর্যন্ত। আমার সমস্ত শরীরে স্পর্শ দিয়ে গেলো যেন সে দৃষ্টি। আমার স্নায়ুগুলো শিরশির করে উঠলো একটু। ও বললো, তুই কেমন করে পারিস তাই ভাবি। কেউ কি তোকে দেখেনি? কেউ কি ভালোবাসতে চায়নি?

কি জানি, অন্য কারো কথা কেমন করে জানবো। আমি হাসছিলাম তখন অস্বাভাবিক রকম। মনকে কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু তবু মনকে লুকানো ভারী শক্ত। আমার সেই ভয়। আর সে জন্যেই আমি অন্য কথায ফিরে যেতে চাইলাম।

রঞ্জু যাবার সময় আবার বললো, সত্যি কি করবো আমি বুঝতে পারছি না মঞ্জু। আমি কি অন্যান্য মেয়েদের মতো হয়ে যাবো। একের পর এক ভালোবেসে যাবো, আর একের পর এক ঠকবো।

ও চলে গেলে আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, কতো বয়স রঞ্জুর। আঠারো নয়তো উনিশ, কিংবা সতেরোও হতে পারে। এই বয়সে এতো সব কথা কেন ভাবে ও। ওর মন এতো জটিল হলো কেন?

আমাকে শুনতে হয় বাইরে এই সব বিচিত্র ঘটনার বিবরণ। আমার বন্ধুদের এই জীবনকে লক্ষ্য করতে হয়। না, আর অন্য কিছু বলে না ওরা। বলে না ওদের মা বাবার কি রকম সম্পর্ক। বলে না ওদের

ভাইরা বেকার থেকে কী অসুবিধায় রয়েছে। বলে না ওদের যথেষ্ট টাকা না থাকার জন্যেই ওদের বিয়ে হচ্ছে কি না। কেন ওর বাবা মা বাইরের ছেলেদের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে বাধা দিচ্ছে না। এ সব এরা কেউ বলে না। কিন্তু আমি বুঝতে পারি। রঞ্জুর কথায়, তাজিনার কথায়, ছোট খালার কথায় আমি বুঝতে পারি আভাসে, কি মিথ্যুক বাইরের মানুষগুলো।

ঘরে বাইরে বইছে ধ্বংসের অন্তঃস্রোত। সবার, হ্যাঁ সবার মনে এই আতঙ্ক গলা পর্যন্ত এসে ঠেকেছে।

নইলে এই সব ঘটনার আবর্ত দেখতে পাচ্ছি কেমন করে। আর এই আবর্তে এরা কেমন করে তলিয়ে যাচ্ছে একের পর এক। ছোট আপা তলিয়ে গেলো। রাহুল থেকেও হারিয়েছে। আর মরলো মীনা। কেউ ঠেকাতে পারছে না। এই প্রবল স্রোতের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে পারছে না কেউ শক্ত হয়ে।

অস্থির একটা পাহাড়ের চূড়ায় যেন সবাই এসে দাঁড়িয়েছে। আর একে একে গড়িয়ে পড়ছে নিচে। কেউ ধরবার নেই, কেউ বাঁচাবার নেই।

বাবা আসেন নি আজ দু' সপ্তাহ হয়ে গেলো। আকরাম আসছে, বেনু আসছে। কিন্তু আগের মতো আর হাসির উচ্ছ্বাস শোনা যায় না। বেনু বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে আমাকে। সেই পুরনো দৃষ্টি, দু'চোখের ওপারে অরণ্যের বুনো অন্ধকার। না কান্না, না উল্লাস, না ঈর্ষা—কিছুই নেই সে দৃষ্টিতে। কিন্তু তবু যেন কিছু আছে। আমি দেখতে পাই মাঝে মাঝে। আর তখনই আমি সোজা এসে দাঁড়াই ওর মুখোমুখি। ওকে চোখ নামিয়ে নিতে হয়। কিছু একটা যেন বলতে চায় ও।

এক সময় নিচু স্বরে বলেছে, আমার ওপর খুব রেগে আছিস, তাই না?

আমি কথা বলিনি, সরে এসেছি ওখান থেকে।

ওরা সবাই ভয় পেয়েছে। মা পর্যন্ত ভয়ে খাবার কথা বলতে পারে না আজকাল। বেন্নুর হাতে এক দুপুরে খাবার পাঠিয়েছিলো। বাবা সেটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে পুতুল মম আর আমার জন্যে মিষ্টি কিনে পাঠিয়েছেন।

কটা দিন, কিন্তু কি অদ্ভুত বদলে গেলো চৌধুরী বাড়ী।

মাঝে মাঝে প্রতিবেশী মেয়েরা আসে। এসে জিজ্ঞেস করে। চৌধুরী সাহেবকে দেখি না যে আজকাল?

বিশেষ করে সাকিনা খালা এমন প্রশ্ন করে আর মা'র দিকে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করে।

আমাকেই মিথ্যা কথা বলতে হয়। বলি, দোকান নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকেন। দিনে আসতে পারেন না।

খাওয়া দাওয়া?

বাড়ী থেকে যায়।

কিন্তু আমি জানি ব্যাপারটা চাপা থাকবে না। বাবা দিনের পর দিন, হোটেল থেকে খাবার কিনে খাবেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের চোখে সেটা নিশ্চয়ই পড়বে। তারপর, তারপর কি হবে?

আমার এমনি অসংলগ্ন এলোমেলো দিনে একদিন আনিস এলো। আমিই দরজা খুলে দিয়েছি। তখন সন্ধ্যা। আমরা সেই মূর্ছিত ম্লান আলোয় মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। গত কয়েকটা দিনের উদ্বেল যন্ত্রণা আর কান্নার কথা ভাবলাম। মাত্র কটা দিনে কত বদলেছি আমি। এই কটা দিন আনিসের কথা মনে পড়েনি সব সময়। আজ এই মুহূর্তে আশ্চর্য লাগলো, ওকে ভুলেছিলাম কেমন করে? আমার বুক ভরে উঠলো গভীর শান্তিতে। এমন দিনে এলো আনিস। যখন আমার পাশে দাঁড়াবার আর কেউ নেই।

আনিস তার দু'হাত আমার কাঁধে রাখলো। আর সেই আবছা অন্ধকার ঘরের মেঝের ওপর আমি ওর বুকে মাথা গুঁজলাম। বললাম, এতো দেরি করলে কেন? আমার এদিকে যে দিন কাটতো না।

কেন?

এতো ঘটনা ঘটে গেলো চারপাশে। শুধু ভাবছিলাম এবার বুঝি আমাকে মরতে হবে। তাছাড়া আর কোন উপায় নেই।

আমার সেই গভীর শান্তি ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে করছিলো না। দু'জনে দাঁড়িয়ে রইলাম, অমনি নিঃশব্দ।

এক সময় ও বললো, চলো বাড়ীর ভেতরে যাই।

না, আরেকটু থাকো।

কোথায় যেন ছেলেমানুষী আবদার বেজে উঠলো আমার কথায়। ও হাসলো। সেই না-অন্ধকার না-আলোয় ওর হাসি কি সুন্দর জেগে উঠলো, আমার ভ্রূর ওপরে।

আরেকবার নিবিড় আবেগে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর ওকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলাম বাড়ীর ভেতরে। দরজার কাছে এসে বললাম, তুমি এখ্খুনি একবার বাবার ওখানে যাও। এ বাড়ীতে অনেক কিছু ঘটে গেছে। বাবা দু' সপ্তাহ বাড়ীতে আসছেন না।

আনিস দাঁড়িয়ে পড়লো, সেকি! কেন?

আমি মা'র ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে বললাম, জানি না কেন। কথাটা বলেই আমি সরে এলাম।

আনিস এলো আর চলে গেলো। সেদিন বাবা এসেছিলেন। এসে বসেছিলেন বাইরের ঘরে। বলেছিলেন আনিসকে, তুমি আরো ক'টা দিন থেকে যাও। বাড়ীর ঝঞ্ঝাট ঝামেলাগুলো মিটিয়ে তারপরে যেও।

একটু থেমে আবার বলেছিলেন, রাহুলটা একেবারে মাটি হয়ে গেলো।

রাহুলকে না হয় আমি নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এখানে থাকবো কেমন করে! দু'দিনের বেশী ছুটি পাওয়া গেলো না।

আমার নিজের জন্যে ভাবছি না, বাবার চিন্তান্বিত স্বর শুনতে পেয়েছি আরেকটু পর। মঞ্জুর জন্যে ভাবতে হচ্ছে ক'দিন ধরে। এখানে রয়েছে বলে ওর চাচারা ওকে আর নিয়ে যাবে না। ওকে দেখে শুনে কারো হাতে তুলে দিতে পারলে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। পরের মেয়ে, এ জন্যেই চিন্তা।

না, এ কথার জন্যেও আমি সেদিন দরজার আড়ালে কান পাতিনি। আমি জানতে চেয়েছিলাম বাবা বলেছেন কি না সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির কথা। কান পেতে, ছিলাম আমি, বাবা আনিসকে অন্ততঃ বলুন।

আনিস এক সময় জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু এভাবে খাটছেন কেন? বাড়ীতে কেন থাকছেন না? শরীরের ক্ষতি হবে যে!

আরে নেবো বিশ্রাম, নেবো। বাবা প্রসন্ন হেসে আশ্বস্ত করতে চেয়েছেন। দোকানটাকে দাঁড় করিয়ে দি। তারপর শুধু সকাল সন্ধ্যা হিসেবপত্র দেখবো আর চলে আসবো।

বাবার কথা এ পর্যন্ত শুনেই আমি চলে এসেছি। রাগ হয়েছে বাবার ওপর, কেন বললেন না সে কথা!

আনিস চলে গেলো। যাবার সময় কোন কথা বলতে পারলাম না। মা এসে দাঁড়িয়েছিলো তখন দরজার কাছে।

আনিসকে সব কথা বলতে পারিনি। কেমন করে উচ্চারণ করবো সেই কথাগুলো। সেই লজ্জা আর ঘৃণার কথা। তবু মনে হয়েছে, আনিস যেন কিছু টের পেয়েছে। আমাকে কষ্ট পেতে দেখে বলেছে, অমন হয়ে যাচ্ছো কেন? কষ্ট আর দুঃখ ছাড়া তো জীবন নয়। নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছো কেন? স্রোতে গা ভাসিয়ে শুধু শুধু ভয় পাওয়ার কোন মানে হয় না। যতোক্ষণ বেঁচে আছি ততোক্ষণ যেন সুন্দর হয়ে বাঁচি।

আমিও জানতাম এ কথা। কিন্তু তবু যেন জানতাম না। অন্ততঃ মনের দিক থেকে অনুভব করিনি। আজ যেন সাহস ফিরে পেলাম। আনিস চলে গেলে মনে হয়েছে, কী ছেলেমানুষের মতো আবোল-তাবোল ভেবেছি আর কষ্ট পেয়েছি। জীবনে কার সঙ্কট নেই?

এবং এই সাহস আমাকে বাঁচিয়েছে। আমি এখন নিয়মিত পড়া-শোনা করছি। নিজের ঘরটাকে মনের মতো সাজিয়ে রাখছি, দেখা-শোনা করছি পুতুল মমের। ঠিক করেছি, কোন ভাবনা আর ভাববো না। সহজ হবো আর হবো স্বাভাবিক। না ওদের মতো সহজ নয়। সেই পঙ্কিল লোভের স্রোতে গা ভাসিয়ে সহজ হওয়া নয়। নিজের মতো সহজ হওয়া। নিজেকে খুঁজে বের করে সহজ হওয়া। যেন স্রোতের মধ্যেও আমি একটি স্বতন্ত্র মানুষ যে স্রোতের মধ্যে সাঁতরেও সহজে ফিরে আসতে পারে নিজের শক্ত তীরে, নিজেই নিজের গতির নিযামক হয়ে।

মাঝে মাঝে আমি এখনও ভাবি, যদি এ-বাড়ীতে না আসতাম তাহলে জীবনের কিছুই পেতাম না আমি। এই দুঃখ, এই যন্ত্রণা, এই ঘৃণা আর তার সঙ্গে এই শান্তি আর স্নিগ্ধতা আমাকে জীবনের বিরাট রূপ দেখিয়েছে। যখন আমি এমন কথা ভাবি তখন আমার কোন খেদ থাকে না, কোন ক্ষোভ থাকে না।

আমি এখন নিজেকেই সাজাতে বসলাম। যে অপরিসীম শূন্যতা আমার বুকের ভেতরটা ছেয়ে রয়েছে সেই শূন্যতা আমি ভরে তুলতে চাইলাম।

মনকে সাজাতে বসলাম আমার সব কাজ আর বিশ্রামের প্রহরে। বারবার বললাম, আমি সুন্দর হবো, শুভ্র হবো। আমাকে বাঁচতে হবে।

এর আগেও আমি বহুবার বলেছি। আমাকে বাঁচতে হবে। এবং সেই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে মনে, কেন? কেন বাঁচতে হবে?

সঙ্গে সঙ্গে মন থমকে গিয়েছে। এ-প্রশ্নের কোন উত্তর জানা ছিলো

না। আর ভয় পেয়েছি তখন। এখন যেন জোর পেয়েছি মনে। নিজেকে বলতে পারি, বাঁচবো আনিসের জন্যে, আমার জীবনের জন্যে।

বাইরে এদিকে দিনের মনে দিন চলে যাচ্ছে। চৌধুরী বাড়ী সেই গতানুগতিক নিয়মে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা একদিন এসেছিলেন, মম আর পুতুলের জন্যে কিছু জামা-কাপড় নিয়ে—আমি দেখলাম তাঁকে। খুব ক্লান্ত মনে হলো। বসতে বললাম, বসলেন। তারপর সহজ আর সাধারণভাবে সংসারের খবরাখবর নিলেন। রাহুল কবে যাচ্ছে পাবনা, তাও জিজ্ঞেস করলেন। তারপর, হ্যাঁ তারপর কি যেন জিজ্ঞেস করতে গিয়ে চুপ করে গেলেন। সেই মুহূর্তে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছিলো। মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম, হে খোদা! মার সম্বন্ধে যেন কিছু আমাকে জিজ্ঞেস না করে। বাবা জিজ্ঞেস করলেন না। আর আমি বাঁচলাম।

এক সময় বাবা বললেন, এক গ্লাস পানি খাওয়াতে পারিস মা?

পানি খাবেন, পানি, এখখুনি আনছি। ছুটে এলাম ঘরে। তাক থেকে কাঁচের গ্লাস নামালাম, চিনি বের করে সরবত তৈরী করে লেবুর রস দিয়ে প্লেট দিয়ে গ্লাসটি ঢেকে বাবার সামনে এনে ধরলাম।

আর সেই সময়, ঠিক সেই সময় দেখলাম মাকে। তখন দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে, কিছু যেন বলবে।

বাবা গ্লাসটা নিয়ে টেবিলের ওপর রাখলেন, তখখুনি সরবত খেলেন না!

আমি বললাম, খেয়ে নিন বাবা।

আচ্ছা খাচ্ছি।

বাবা একটু পর জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা আকরাম আসে না আজকাল।

কি জবাব দেবো আমি? এ কথা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন? একটু চুপ করে থেকে বললাম, হাঁ আসে।

বুঝলাম, যাকে শোনাতে চান বাবা কথাগুলো। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিদ্রূপে কঠিন হয়ে উঠেছে তাঁর মুখ। আর সেই ঘৃণায় ভরা মুখেও ফুটে উঠেছে এক টুকরো হাসি। সে হাসিতে তীব্র বিদ্রূপ। তারপর হঠাৎ গলা খুলে হেসে উঠলেন আব্বা। তারপর বললেন, তোর মা কেমন আছে মঞ্জু?

আমি তখন বসে পড়েছি মেঝেতে দু'হাত ঢেকে। আর সেখানেই আর্তনাদ করে উঠেছি, বাবা!

বাবা আমাকে টেনে তুললেন, কি হয়েছে? কি হয়েছে মঞ্জু? বাবার উদ্বিগ্ন স্বর। আমার কান্না পেলো তখন। বললাম, কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছেন আমাকে।

বাবা চুপ করে দাড়ালেন কয়েক মুহূর্ত। আমার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। সরবত খেলেন কয়েক চুমুক, তারপর পা বাড়ালেন দরজার দিকে। আর তখনই, ডাক শুনলাম। মা ডাকছে, শোন।

আমি ভয়ে তখন পিছিয়ে এসেছি। দরজার সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমার হাতের কাঁচের গ্লাসটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে মেঝেময় ছড়িয়ে পড়লো।

আমি দাড়ালাম না। কেউ যেন তাড়া করে ছুটে আসছে—পেছনে তাড়া করে।

আমার সাহস কোথায় গেলো। নিজের ওপরই দুঃখ হলো। কেউ যেন বললো আমাকে, তোর না বড় সাহস মঞ্জু! ছুটে গিয়েছিলি স্রোতের মুখোমুখি দাঁড়াতে। ভেবেছিলি সব বাধা পার হয়ে এগিয়ে যাবি, কোথায় তোর সেই সাহস? ভয় যে তোর মনের ভেতরে, ভয় যে তোর রক্তে রক্তে ছড়ানো।

হ্যাঁ, ভয় আমার সেই ভীষণ আর ভয়ঙ্কর নগ্নতাকে। আমার ঘৃণা আর হিংস্রতাকে। আমি কি করবো, কি করবো?

আমার মনে। চেতনার চিরকালের প্রশ্নটা বেজে উঠলো, কি করবো, আমি কি করবো?

এই সেদিন আমি সঙ্কল্প করেছি, সাহস পেয়েছি মনে, আজ কোথায় গেলো আমার সেই সঙ্কল্প, কোথায় গেলো আমার সেই সাহস? আমি তো আগের মতোই দুর্বল। শুধু ভয় করছি চারিদিকের জগৎকে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি আবার ফিরলাম। যাবো, মুখোমুখি দাঁড়াবো মা'র। বাবাকে বলবো আমার সব কথা। আমার ঘৃণার আর যন্ত্রণার আর কষ্টের কথা। বলবো, এভাবে কেউ বাঁচতে পারে না। এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে আমরা কেউ বাঁচবো না।

কস্ত ঘরে এসে দেখি, মা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাবা নেই ঘরে।

মা আমাকে দেখে বললো, তোর বাবা লোকটা ভীষণ জেদী মঞ্জু, সত্যি সত্যি বোধ হয় এ বাড়িতে আর আসবে না।

মা'র কথা বলার ভঙ্গী দেখে মনে হলো, বাবা যেন মা'র কেউ না, বাইরের লোক!

বুঝলাম মা বাবাকে অনুরোধ করতে এসেছিলো। একটু আগেই হয় তো হাত পা ধরতে চেয়েছিলো। দেখিনি আমি, তবু মনে হলো, মা সব করতে পারে। আর সে কথা মনে হতেই ঘেন্নায় আমার গা রিরি করে উঠলো।

এতো সব ঘটনা ঘটে যাবার পরও শুধু টাকা আর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে কেমন করে পারছে বাবার সম্মুখে হাত বাড়াতে।

আমি সরে এলাম। মা'র সঙ্গে কোন কথা না বলে।

এই তো আমার জগৎ, চারপাশে সীমানা দিয়ে ঘেরা। বাইরে বেরুলেই চারটে প্রাচীর আর ঘরে ঢুকলে চারটে দেয়াল। বাইরে কিছুই দেখতে পাই না। আর সে জন্যেই হয়তো দেখতে হচ্ছে আমাকে আমার চারপাশের মানুষগুলোকে। কেউ আমাকে বাইরে

কোথাও নিয়ে যায় নি। কোথাও যেতে পারি না। আর কোন দিন পারবো কিনা তাও জানি না।

এই গতানুগতিক জীবন আর পরিচিত পুরনো মানুষগুলোর ভেতরে এতো রয়েছে জানবার, এতো রয়েছে বুঝবার যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তাই ঘুরে-ফিরে আবার ওদের কথাই আমাকে ভাবতে হয়।

বাবা চলে যাওয়ার পর মাকে বারান্দায় দেখে আমি ফিরে এলাম কোন কথা না বলে। কিন্তু উঠানে এসে মা'র কথাই ভাবলাম। এবং একটু আগে যে ঘৃণা হচ্ছিলো মা'র ওপর সেই ঘৃণা যেন একটু একটু করে মরে গেলো মন থেকে।

মা তো অমন করবেই। দাঁড়াবার যে আর জায়গা নেই। আজ হোক, কাল হোক, বাবার পায়ে গিয়ে পড়তেই হবে।

আকরাম এলো সেদিন। লক্ষ্য করলাম মা কোন কথা বলছে না। বললেও খুব ধীরে ধীরে বলছে। আর একটু পরই বেনু এলো। ও যে কখন এসেছে টের পাইনি। এক সময় আমার খুব কাছে এসে মৃদু ডাকলো, মঞ্জু!

চমকে ফিরে তাকালাম, কি ?

কত দিন আর কষ্ট দেবে এভাবে ?

আমি ওর কথার জবাব না দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। আর সেই মুহূর্তে আনিসের কথা মনে পড়লো। একটু আগে আমি সাহসে বুক বেঁধে ছুটে গিয়েছিলাম। আর এই মুহূর্তে পালিয়ে এলাম। আমার নিজেরই ওপর বিরক্তি লাগলো। দরজা খুলে আবার বাইরে এলাম। তখন বেনু মা'র ঘরে গল্প করছে।

আবার আমি নিজের ঘরে বসে বইয়ে মন দিলাম।

বাবা-নেই। এ্যাপোপ্লেক্সির স্ট্রোক হয়েছিল।

আনিস এলো। ছুটে গিয়ে ওর কাছে দাঁড়ালাম, ভয়ে আর আতঙ্কে কথা বেরুচ্ছিলো না আমার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। ওর কাছে কেঁদে ফেললাম। আনিসকে দেখে মা'ও কেঁদে ফেললো। মা'কে দেখে আনিস থমকে উঠলো।

চৌধুরী বাড়ি তেমনি আছে। বাইরে থেকে এ বাড়িতে ঢুকতে গেলে প্রথমেই পার হতে হবে বড় দেউড়ি, তারপর ছোট দেউড়ি। চোখে পড়বে মস্ত প্রাচীর। বড় বড় ঘর। ওপর তলার ফাটা ছাদশূন্য ঘরগুলো, হাওয়ায় শোনা যাবে জানলাগুলোর ঝাপটানি। সেই মম, পুতুল, রাহুল, মা সব ঠিক তেমন আছে।

এই সেদিন বাবা গ্লাসে করে সরবত খেয়েছেন, আমি তৈরী করে দিয়েছি সেই সরবত। বাবা বসেছিলেন বারান্দায়, আমার কান্নার সময় সান্ত্বনা দিয়েছেন পিঠে হাত বুলিয়ে।

আজ বাবা নেই। নেই কথাটা কত সহজ। কিন্তু অনুভব করতে গেলেই যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। এই তো ছিলেন, এখনই নেই। এতো বড় বাড়িটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মনে হচ্ছে, নেই। এত বড় এই বাড়িটার ভেতরে কী যেন ছিলো, তা নেই এখন। সেই পরম নির্ভরতা, সেই গাম্ভীর্য, সেই অহমিকা —এ সব কিছু নেই যেন। এখন এটা পোড়োবাড়ি। ভেঙ্গে পড়ার আগের মুহূর্তটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেদিন ভোরে বাবাকে নিয়ে এলো কয়েকজন লোক। জ্ঞান নেই বাবার। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। ধরাধরি করে এনে বিছানায় শোয়ানো হলো। মা তখন চিৎকার করে কান্না জুড়েছে। আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠালাম।

একটু পরে রাহুল এলো। ও-ই ছুটোছুটি করে ডাক্তার ডেকে আনলো, ওষুধ আনতে ছুটলো। আমার বুক ফেটে তখন কান্না

আসছে, কোন রকমে দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছি। কেন না বুঝতে পারছিলাম, বাবা আর সুস্থ হয়ে উঠবেন না। এই শেষ।

বাবা আমার কেউ না। তবু কান্না পেতে লাগলো। দাদুর মৃত্যুতে এমন করে বুক ভেঙ্গে কান্না আসেনি। এখন বারবার করে আমি চোখ মুছছি আর উদ্বেল কান্নার আবেগটাকে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছি। ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছি তীব্র উদ্বেগ নিয়ে। দেখলাম ডাক্তারের জরাজীর্ণ মুখে নৈরাশ্যের ছায়া দুলিয়ে একটু। ফুটলো কি ফুটলো না, ঠিক বোঝা গেলো না। কিন্তু আমি বুঝলাম।

ডাক্তার পরে আমাকে ডেকে বললেন, এ্যাপোপ্লেক্সির স্ট্রোক হয়েছে, রোগীকে খুব সাবধানে রাখতে হবে। কোন রকম শারীরিক মানসিক উত্তেজনা যেন না হয়। তা' হলেই খারাপ হবে। আটচল্লিশ ঘণ্টা খুব সাবধান, খুব সাবধান!

আবার বললেন ডাক্তার, জ্ঞান হয়তো ফিরে আসতে পারে, তখন যেন কাছে এমন কেউ না থাকে যাকে উনি দেখতে পারেন না।

রোগীর ঘরে একজন ছাড়া অন্য লোক থাকা বারণ।

মা তখন কেঁদেকেটে একাকার হয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, কেন হলো এমন?

খুব দুশ্চিন্তা অথবা স্নায়বিক পরিশ্রম হয়ে থাকলে এমন কিছু বিপর্যয় হয়। বিশেষ করে যাদের বয়স হয়েছে।

ডাক্তারের কথায় আমি মা'র মুখের দিকে তাকালাম। মা মুখ নিচু করলো। বললো, আমি এতো নিষেধ করেছি, আমার কথা কোনদিন শুনলো না। আমি এখন কি করবো, কি হবে আমার?

মা! ধমকে উঠলাম আমি, এ ঘর থেকে তুমি যাও।

অনেক দিন পর আমি মা বলে ডাকলাম।

মা চমকে উঠলো। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললো, কেন এ ঘরে থাকবার অধিকার কি নেই আমার? তুই কি সব নাকি?

আমার সমস্ত মন ক্ষোভে দুঃখে স্তব্ধ হয়ে গেলো।

মা তখন ডাক্তার সাহেবকে বলছে, দেখুন তো, আমি এ ঘরে না থাকলে কে দেখবে ওকে এখন।

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই তো, আপনারই তো থাকা উচিত, তবে এমন-ভাবে হতাশ হবেন না। মনে জোর আনবেন।

আমি কেমন করে বলি এখন, মা তুমি এ ঘরে থাকলে বাবা বেঁচে উঠবেন না। মেরে ফেলবে ওঁকে।

ডাক্তার মরফিয়া দিয়ে গেলেন। আটচল্লিশ ঘন্টা ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে। ব্রেন টিস্যু ছিঁড়ে হেমোরেজ হয়েছে যতক্ষণ না রক্তটা ক্লট করে যায় ততক্ষণ কিছু বলা যায় না। মাঝে মাঝে অস্থির হলে কিছু গ্লুকোজ অথবা দুধ কিম্বা ফলের রস খাওয়াতে হবে।

আমি বসে রইলাম ঘরের দরজার কাছে চেয়ার পেতে। আর ঘড়ির দিকে নজর রাখলাম। আটচল্লিশ ঘন্টা কখন পার হয় আর কখন বাবার জ্ঞান ফেরে। জ্ঞান ফিরলে মাকে যেন না দেখতে পান।

আনিসকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে। ওরা কখন আসে কে জানে, যদি আসতো আজই।

অতন্দ্র জেগে রইলাম উৎকর্ণ হয়ে। যদি একটু শব্দ পাই বাবার জেগে ওঠার, তাহলে ছুটে গিয়ে দাঁড়াবো কাছে। বার বার প্রার্থনা করছি, দিনের বেলা যেন জ্ঞান না ফেরে, ফেরে মাঝ রাতে, যখন মা ঘুমিয়ে থাকবে, আর আমি গিয়ে দাঁড়াতে পারবো বাবার কাছে।

সব সময় রাহুল থাকলো কাছে কাছে। কখনো দাঁড়িয়ে কখনো বসে।

বাড়িটা নিঃশব্দ। মহু, পুতুল ছায়ার মতো ঘোরাফেরা করছে। মাঝে মাঝে ওরা অল্প একটু কেঁদে উঠলে রাহুলই ওদের দেখছে।

আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, ঘরের ভেতরে মা বাবার মাথার কাছে বসে। আর প্রতীক্ষা, ক্লান্তিকর উদ্বেগাকুল দুঃসহ প্রতীক্ষা।

দিনে তিনবার করে ডাক্তার আসেন, চলে যান। রাহুল পকেট থেকে টাকা বের করে দেয় নিঃশব্দে। অল্প একটু কথাবার্তা, ফিসফিস করে। তারপর আবার চুপ। আমি বাইরের ঘরের ঘড়িটার টক টক শব্দ শুনতে পাই। কেউ যেন আসছে। তার পায়ের শব্দ শক্ত মেঝেতে বেজে উঠছে। আর সেই শব্দ অনন্তকাল ধরে এগিয়ে আসছে।

মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক থাকার পর হঠাৎ সেই ঘড়ির শব্দে চমকে উঠেছি। ভয় শিউরে উঠেছে মনের ভেতরে।

বোধ হয় কোন মৃত্যুদূতের পায়ের শব্দ। কোন মানে হয় না, তবু আজেবাজে অবাস্তব কতগুলো চিন্তায় আমার মন আচ্ছন্ন থাকলো। থেকে থেকে চমকে উঠলাম।

মাঝ রাতে সেই শব্দটা যেন আরো স্পষ্ট হয়ে বাজতে থাকে। মনে হয় ওপরতলার শূন্য ঘরগুলো থেকে শব্দটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। হেঁটে ফিরছে ওদিকের বারান্দায়। কিম্বা ঘরে, কিম্বা আবার উঠে যাচ্ছে সিঁড়ি বেয়ে।

সারাটা বাড়ি নিঃশব্দ, আর সেই অসহ নিঃশব্দতার মাঝখানে একটা বিরতিহীন টকটক অন্ধকার শব্দ আসছেই, আসছেই।

দুটো দিন গেলো। আমার চোখ জ্বালা করছে। মাথা তুলতে পারছি না যন্ত্রণায়। যা ঘটছে চারপাশে, আবছা আবছা দেখছি সব। মাঝে মাঝে ঝাপসা মনে পড়ছে এক সময় বাবার জ্ঞান ফিরবে আর তখনই আমাকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে সম্মুখে। শুধু এইটুকু মনে রয়েছে, আর সব এলোমেলো।

এক সময় রাহুল এসে ডাকলো, যা ঘুমো একটু, নইলে অসুখ বাঁধিয়ে বসবি।

মা অনেকবার এসে আমাকে ঘুমোতে বলে গিয়েছে। মা'র কথায় কান দিইনি। কিন্তু সেই মুহূর্তে এতো ক্লান্ত লাগলো নিজেকে, বাহুলের হাত ধরে ঘরে এসে বিছানার ওপর গড়িয়ে পড়লাম। তারপর আর কিছু জানি না। নিঃশব্দ অন্ধকারেও মাঝে মাঝে সেই ভুতুড়ে শব্দটা শুনতে পেলাম।

ঘুম ভাঙলো রাহুলের ডাকাডাকিতে। উঠে ত্রস্তে ছুটে এলাম এ ঘরে। বাহুল বলছে, বাবার জ্ঞান ফিরে এসেছে।

আমি এসে দেখলাম বাবা মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন।

ভোরের দিকে জ্ঞান ফিরে এসেছিল, মা জানালো, আমাকে দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলেন, আর এদিকে তাকাননি।

মা'র মুখ উজ্জল, বাহুলের মুখে স্বস্তির ছায়া। বাবার জ্ঞান ফিরেছে।

কিন্তু আমি বুঝলাম সব শেষ হয়ে গেলো। দুরন্ত কান্না বুকের ভেতরে তোলপাড় করে উঠলো। এরা জানে না কি হয়েছে। বাবা এদিকে আর কোনদিন ফিরে তাকাবে না। ঘৃণায় আর দুঃখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন চিরকালের জন্যে। যদি মা জানতো। যদি বাহুল জানতো!

আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠালাম। বাহুল নিয়ে এলো ডাক্তারকে। আমাকে ডেকে বললেন, তোমার সঙ্গে কি তোমার বাবার সম্পর্ক ভালো ছিলো না?

মাথা নাড়লাম আমি, সেই মুহূর্তে মিথ্যে কথা বলতে বাধলো আমার। জানুক, অন্ততঃ একজন লোকও জানুক, বাবা মরে নি, বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। বললাম, বাবা মা'কে ঘৃণা করতেন।

ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন। তারপর বললেন, আশ্চর্য!

দেখলাম তিনি রাহুলকে ডাকলেন, কি যেন বললেন, আর রাহুল ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো।

সব শেষ হবে। এবার প্রায় নিশ্চিত জানা গেলো ভবিষ্যতের কোন ভয়ঙ্কর রূপ দেখতে পাবো আমরা।

আমি একাকী দাঁড়িয়ে রইলাম। সারা বাড়ীর লোক ছুটোছুটি করছে। ডাক্তারের পর ডাক্তার আসছে। উদ্বেগ আর আশঙ্কা। যে মামারা কোনদিন আসেন নি, তাঁরা এলেন। বাবার বন্ধুরা এলেন, বড় খালা এলেন। খালু সাহেবেরা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললেন। আর প্রতীক্ষা করলো সবাই। কখন বাবা বামে হেলানো মাথাটা আবার ডাইনে ফেরান।

সকাল গেলো, দুপুর গেলো, তারপর বিকেল। এক সময় গেটে রিকশা থামবার শব্দ শুনতে পেলাম। সেই সঙ্গে ব্যস্ত পায়ের শব্দ। আমি সেই মুহূর্তে ছুটে গেলাম। দরজা খুললাম। আনিস।

ও উঠে এলো ঘরে। ওকে দেখে আমি তখন দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠতে চেয়েছি। ও কিছু বললো না। পিঠে হাত রাখলো। তারপর ধীরে ধীরে উঠোনের দিকে এলো। হ্যাঁ, ধীরে ধীরে। বোধ হয় আশঙ্কা নিয়ে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছিলো ও সেই আশঙ্কার শেষ সামানা দেখতে পেলো আমার মুখের ওপর।

ওকে দেখে ঘরের ভেতরে মা কেঁদে উঠলো। আর তক্ষুনি, ঠিক তক্ষুনি ধমকে উঠলো আনিস, চুপ করুন। কাঁদবার অনেক সময় পাবেন পরে।

এই দুটো দিন আমি দাঁতে দাঁতে চেপে রেখেছিলাম আমার সব কান্না। আজ আনিসের কাছে আমার সেই সংযম ভেঙে গেলো।

সন্ধ্যা ফুরিয়ে রাত হলো। আমি বারান্দায়। আনিসের মুখ দেখা যাচ্ছে। চিবুকে দৃঢ় একটা কাঠিন্য দেখতে পাচ্ছি। ওর কপাল ঘামে চক্‌চক্‌ করছে। লালচে হয়ে উঠছে দুটো চোখই। বোধ হয় রাতে ঘুমোতে পারে নি। সারাক্ষণ ভাবছে।

তারপর এক সময় সব শেষ। ডাক্তার কাছে বসেছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনিসকে ডেকে বললেন, আনিস উই হ্যাভ ট্রায়েড আপ টু দি লাস্ট, নাউ ইট ইজ এণ্ডেড্। আই এ্যাম সরি।

আনিস ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে দেখলো বাবাকে। তারপর চাদর দিয়ে বাবার মুখ ঢেকে দিলো।

আরেকবার আর্তনাদ করে উঠলো ওদিকে মা। মম, পুতুল, ক'দিন ধরে বুক চাপা ভয় বুকে নিয়ে বেড়াচ্ছিলো, ওরাও কেঁদে উঠলো। আনিস ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

আমি মম ও পুতুলকে নিয়ে একপাশে চলে গেলাম। আর শুনলাম, মা আর্তনাদ করছে, আমার কি হবে!

মৃত্যুর পরও থাকে বিস্ময়। মৃত্যুর পরও থাকে জন্মের ইশারা।

খালার মুখেই শুনলাম। বলাবলি করছে, দুটি ছেলেমেয়ে, আরো একটি আসছে।

কী নিষ্ঠুর মৃত্যু! আর কী কুৎসিত জন্ম!

কিন্তু কেউ জানে না, কেউ জানে না। সবার অলক্ষ্যে জীবন আর মৃত্যুর কোন লীলা ঘটে গিয়েছে তা কেউ জানে না।

আনিস তার পর দিনই চলে গেলো।

এবং চৌধুরী বাড়ি যেন তার পেছনে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো, কাদামাটিতে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মাথা গুঁজে। তার সব অহঙ্কার সব দম্ভ আর সব অহমিকা এখন শূন্য হয়ে গেলো। আমি দেখলাম, অনুভব করলাম। কিন্তু বলতে পারলাম না।

এদিকে দোকানের চাবি মা নিজের আঁচলে বাঁধলো। ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্ট বার করে এনে দিলো আকরাম। পোস্টাপিসের পাশবই দু'খানা খুঁজে নিয়ে এলো বেনু।

আমি দেখলাম আর ভাবলাম, এবার হুড়মুড় করে মস্ত দালানটা ভেঙ্গে পড়বে। যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাবে।

কটা তো দিন মোটে, বাবা নেই। তাঁর দরাজ গলার ভরাট স্বর ঘরগুলোর দেয়ালে দেয়ালে গম্‌গম্‌ করছে না, তাঁর পায়ের বলিষ্ঠ শব্দ বারান্দায় হেঁটে ফিরছে না। মোটে ক'টা দিন আর এরই মধ্যে সম্পূর্ণ বদলে গেলো চৌধুরী বাড়ি। কী নিষ্ঠুর রকমের শূন্য, কেউ নেই যেন বাড়িটাতে। কেউ না। যতো লোক দেখছি, সব বাইরের। দু'দিনের জন্যে এসেছে যেন, আবার চলে যাবে। মাঝ রাতে যখন প্রবল হাওয়া বয়ে যায়, তখন দোতলার ভাঙা ঘরগুলো থেকে হুহু করে শব্দ বাজে। আর আমার বুকের ভেতরে কেমন করে ওঠে। কোন প্রেতাত্মা যেন একটার পর একটা পাথর চাপিয়ে দিচ্ছে বাড়িটার ওপর। সারারাত আমার ঘুম আসতে চায় না।

কোন একটা অন্য মেয়ে যেন আমার মনের ভেতরে কথা বলে সব সময়। এখন, এখন কি করবি তুই? কোথায় যাবি? তোর না বড় সাহস ছিলো! ছুটে যেতে চেয়েছিলি শহরের দিকে। নিজের বুদ্ধির ওপর নিজের শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে ঘেন্না করেছিলি গাঁয়ের মেয়েদের জীবনকে। তোর না বড় সাহস, তুই ভালোবাসতে গিয়েছিলি। মঞ্জু; এখন? এখন কি করবি তুই! এখন তো করবার মতো কিছু নেই তোর। স্রোতের মুখে কুটোর মতো ভেসে যাওয়া ছাড়া।

আমি সেই মেয়েটার কথা শুনতে পাই আর ভয়ে সারা মন হিম হয়ে যায়।

সত্যি তো, কি করবো!

বার বার আমি সাহস করেছি। আর সম্মুখে হাত বাড়িয়েছি। সুন্দর হবার জন্যে আর বার বার বাধা এসেছে একের পর এক। একে একে সেই বাধার পাহাড়, কষ্টের প্রান্তর পার হয়েও দেখতে পেয়েছি সম্মুখে আবার বাধা। আমি আর কতো পারবো।

আমার সব সুখ, সব সাধ একে একে মরেছে—হায়রে, মরেই যদি

ফুরাতো তাহলে যে কথা ছিলো না। আবার আমি হাত বাড়িয়েছি সম্মুখে, নতুন করে সুখ এসেছে মনে, নতুন করে সাধ জন্ম নিয়েছে হৃদয়ে।

এখন কি করবো আমি!

তবু দিনের মনে দিন চলে গেলো। দেখলাম, সেই কখন চৈত্র এসেছিলো আকাশে প্রচুর ভ্রূকুটি আর বুকজোড়া পিপাসা নিয়ে। সেই পিপাসা ছড়িয়ে ছিলো তীব্র হাওয়ায়। ফুটিয়ে ছিলো শিমুল পলাশ। এখন আসন্ন বর্ষা। মাঝখানে কখন যে ফুটিফাটা গ্রীষ্ম গিয়েছে, দেখতে পাইনি। এখন কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায় ফুল। দূর দক্ষিণে ঘন সবুজ দেবদারু গাছের মাথার ওপর দিয়ে কালো কালো মেঘ ধেয়ে আসে। কোথাও যেন বৃষ্টি হল। হাওয়ায় ভাসে সেই বৃষ্টির গন্ধ। আর দেখি আমাদের বাড়ির প্রাচীরের ফাটলে সবুজ শ্যাওলা গজিয়েছে, সেই সবুজ শ্যাওলার ওপর গুঁড়ি গুঁড়ি বেগুনি রঙের ফুল। লাল লাল ঘাস ফুল ফুটেছে উঠোনের দুপাশে। মাঝে মাঝে যখন চোখ পড়ে তখন বুঝতে পারি বড় রাস্তার দু'পাশে জারুল গাছ[illegible] প্রমত্ত হাওয়া বয়ে যাচ্ছে, এখন বেগুনি রঙের ফুল ঝরে পড়বে রাস্তার ওপর আর দুলবে দূরের শিরীষ ফোটা হলদে রঙের ডালগুলো।

নিঃশব্দ চৌধুরী বাড়ির শান বাঁধানো উঠোনে কিম্বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি দেখি বাইরের আকাশটাকে, দূরের গাছপালা-গুলোকে। ধূসর আকাশে মেঘ ডাকে, ঝিমঝিম বৃষ্টি পড়ে আর এলোমেলো হাওয়া বয়।

আমার আর কিছু ভালো লাগে না। রান্নাঘরে ইচ্ছে হলে যাই, নইলে যাই না। এখন আমাদের অনেক টাকা। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাওয়া গেছে কিছু, ইনসিওরেন্সের টাকাও পাওয়া গেছে। আকরাম দোকানে বসছে আজকাল। সেই টাকা খরচ হচ্ছে। রান্নার জন্যে ঝি আছে, মম পুতুলকে দেখবার জন্যে একটা বাচ্চা ছেলে রাখা হয়েছে। আমার প্রচুর অবসর আজকাল।

মা উজ্জ্বল হয়েছে আরো। দেখতে ইচ্ছে করে একেক সময়; দুটো চোখে কালো কালো ক্লান্তি দেখি তবু ভালো লাগে। মা যেন আবার পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

আকরাম কোন কোনদিন দোকান থেকে এ বাড়িতে আসে। সকাল বেলা চলে যায়।

ক'দিন হলো! বাবা মারা যাবার পর কদিন হলো! আমি দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাই।

এক মাসও পুরো হয়নি। কিন্তু মনে হয় যেন কতো দিন হয়ে গেছে।

চল্লিশ দিনে ফাতেহা পড়ানো হবে। তার আয়োজনের কোন চিহ্ন নেই।

আর এ জন্যে আমাকে চিঠি লিখতে হলো আনিসের কাছে।

আমার সব ভাবনার মধ্যেও আমি চোখ ফেরালাম বাইরের দিকে। বদলে যাচ্ছে বাইরের জগৎটাও। মানুষই শুধু বদলে যায় না। বদলায় প্রকৃতিও। বৃষ্টি এলো, বৃষ্টি গেলো, যে সব গাছে ফুল দেখিনি সে সব গাছে ফুল ফুটলো। রাস্তার মোড়ে, সেই যে আনিসের সাহিত্যিক বন্ধু চন্দনদের বাড়ি, সেদিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম রঞ্জুর সঙ্গে ক'দিন আগে। ওদের বাড়ির পাশের বকুল গাছটায় অজস্র ফুল ফোটে। মৌমাছির গুনগুন সারাদিন, তার সঙ্গে মিষ্ট গন্ধ। সেই গুনগুন স্বর আর মিষ্টি গন্ধে নেশা ধরে আসে। সেদিন আসতে আসতে দেখলাম একটা চাঁপা গাছ। সেখানেও গন্ধের ছড়াছড়ি—মৌমাছির গান। ফুটছে আর নিজেদের ছড়িয়ে দিচ্ছে চারপাশে। এই কি ফুটে ওঠার ধর্ম। শুধু নিজেকে ছড়িয়ে দেয়া। বিলিয়ে দেয়া!

আমি ভাবি আর আমার অবাক হওয়ার পালা। আনিসের সেই বন্ধুকে দেখেও অবাক হলাম। দিনরাত আজকাল লিখছেন।

চন্দনও ফুটে উঠছেন ফুলের মতো। নিজেকে চারপাশে বিলিয়ে দিচ্ছেন। ও'দের বাড়িটাও কতো আশ্চর্য। এতো লোক বাড়িতে তবু কারো সঙ্গে কারো কোন বিরোধ বলে মনে হলো না। সবাই যেন বিলিয়ে দিয়েছে নিজেদের স্নেহ, প্রীতি, আর ভালোবাসায়। ওরা চার ভাই, বড় ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে। দু'বোনের এক বোনের বিয়ে হয়েছে, সেও ওদের সঙ্গেই থাকে। ওদের নিজের মা নেই, সৎ মা। তবু ওদের বাড়িটা যেন শান্তিতে ছাওয়া। রঞ্জু কথা বলে যাচ্ছিলো, আমি শুধু দেখছিলাম। আর ভাবছিলাম এরা কতো সুখী। সে বাড়ির বৌটি অনেকক্ষণ গল্প করলো রঞ্জুর সঙ্গে। আমাকে দু' একটি কথা জিজ্ঞেস করলো, স্বল্প উত্তর করলাম, কিন্তু আলাপ জমলো না।

আমি যে দেখছিলাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করছিলাম এরা সুখী—কিন্তু কোথায় এদের সুখ? এরা সুখী—কিন্তু আমরা সুখী হতে পারলাম না কেন? আর সবার থেকে এরা কেমন করে আলাদা থাকতে পারছে! ধ্বংসের স্রোতের মাঝখানে এরা যেন সুখের একটুখানি দ্বীপ।

পথে রঞ্জু জিজ্ঞেস করলো, কেমন লাগলো!

মনে হলো ওরা খুব সুখী।

সুখী না ছাই। ঠোঁট উল্টালো রঞ্জু। যা দেখছিস ঐ বাইরেই। আমি তো প্রায়ই আসি, সব জানি। ভেতরে ভেতরে খুব কষ্ট ওদের। টাকা পয়সার অভাবে কতো দিন রান্না চড়ে না। ওই বউটার সঙ্গে কারো বনিবনা হয় না। বড় ছেলে সংসারের দিকে উদাসীন।

আমি ওর কথায় বিস্ময় বোধ করছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেসে উঠলাম। বললাম, এমনি বনিবনা না হলে কিম্বা সংসার সম্বন্ধে উদাসীন হলেই বুঝি সুখী হওয়া যায় না। ওরা যেমন সুন্দর একে অন্যের জন্যে ভাবে। আমার খুব ভালো লাগলো। আমার থাকতে ইচ্ছে করছিলো ওদের ওখানে আরো কিছুক্ষণ।

রঞ্জু চোখ বড় বড় করলো, ওমা, তাই নাকি! না দেখেই এমন, দেখলে না জানি কি করবি?

আমি ওর ঠাট্টা বুঝছিলাম না। ওর দিকে তাকাতেই ও বললো, বুঝলি না?

না।

ও-বাড়ির মেজো ছেলে চন্দনকে দেখেছিস?

না।

ওর তো বিয়ে হয়নি। যদি রাজী থাকিস, তা'হলে—

তাহলে কি?

চেষ্টা করে দেখি।

পারবি? আমি এবার পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

পারবো না মানে?

না পারবি না, আমি হাসলাম।

কেন পারবো না!

প্রাণ থাকতে পারবি? কোন মেয়ে তো পারে না।

থাক [illegible] থাক, আর বলতে হবে না। রঞ্জু লজ্জায় রাঙা হলো। জানিস আব্বা সেদিন বলছিলেন....

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, ওর কথা শোনার জন্যে।

তক্ষুনি জামিলের কথা মনে পড়েছিলো আমার। রঞ্জু যেন লক্ষ্য করলো আমাকে, তারপর সহজ হাসিতে উড়িয়ে দিতে চাইলো, এতো-ক্ষণের আলাপ। বললো, থাক ভাই ও-সব কথা, আমার ঘর তো ঠিক হয়েই আছে। জামিলকে না পেলে মরতে হবে আমাকে। কিন্তু জানিস? রঞ্জু যেন কিছু জানাতে চাইলো একটু পর।

কি?

লোকটা বড় বেহায়া। তার চালচলন কি বিচ্ছিরি। বারান্দার ওপর কায়দা করে বসে থাকবে আর ড্যাব ড্যাব চোখ মেলে তাকাবে। আমি একবার ও-পথ দিয়ে গেলেই হয়েছে। যতোক্ষণ

খেতে পাবে ততক্ষণ তাকিয়ে দেখবে। আমার গা জ্বালা করে এক্কেক সময়।

মিথ্যুক, তুই মিথ্যুক রঞ্জু, আমি তখন মনে মনে বলেছি। নিজেকে শুধু লুকোতে চাস। সাহস নেই তোর সত্যি কথা স্বীকার করে নেবার। জামিলের কাছে মিথ্যুক তুই, আমার কাছে মিথ্যুক, আর তোর নিজের কাছে, নিজের কাছেও তুই মিথ্যুক। ওকে কোন কথা বললাম না। ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম শুধু।

ও একটু হোঁচট খেলো পথ হাঁটতে। বললো, কি রে কি দেখছিস?

না, কিছু না।

না ভাই, তুই কিছু ভাবছিস?

হ্যাঁ ভাবছিলাম, জামিল খুব ভাগ্যবান।

কেন?

তুই ওকে কতো গভীর ভালোবাসিস যদি জানতো!

রঞ্জুর মুখ গম্ভীর হয়ে গেলো। আমি যদি জামিলের কথা না তুলে আনিসের লেখক বন্ধুর কথা বলতাম, আর জানাতাম [illegible]তার প্রেমে পড়ে গেছে বলেই অমন করে তাকিয়ে দেখে, তাহলে খুশী হতো খুব।

রঞ্জুকে আজ আমার অবাক লাগলো। আমি বুঝতে পারি জামিলের এখন আর কোন আকর্ষণ নেই যে ওকে কাছে টানতে পারে। এরই নাম কি প্রেম, এরই নাম কি ভালোবাসা? শুধু একটুখানি ছেলেমানুষী? জীবনের ওপরকার একটুখানি কাঁপন শুধু। তাহলে, এদের জীবন কি ছোট্ট একটুখানি শান্ত জলাশয়, যেখানে একটু ঢিল ফেললেই কাঁপন জাগবে?

আজ দুপুরে আনিসের চিঠি এলো। আমার মন এতো খুশী তখন। নিজের খুশী লুকোবার কোন চেষ্টাই করলাম না। পিয়ন চিঠিটা

দিয়েছিলো মম্‌-এর হাতে। মম্‌ মায়ের হাতে দিতে যাচ্ছিলো। আমি মম্‌-এর হাত থেকে ছোঁ মেরে নিলাম। দেখলাম ওর হাতের লেখা, সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আমার তখন লজ্জা। কোথায় লুকোই এ লজ্জা! নিজেরই কাছে লজ্জা লাগছিলো। চোখ তুলতেই দেখি মা দাঁড়িয়ে আমাকে অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছে। জিজ্ঞেস করলো, কার চিঠি?

জানি না, কেমন করে, কি ভাবে, সহজেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো,—আনিস লিখেছে।

আনিস ভাই নয়, বড় ভাই নয়, শুধু আনিস। মা বোধ হয় বুঝতে পারেনি প্রথম। আবার জিজ্ঞেস করলো, কোন আনিস?

আনিস ভাই, আমাদের আনিস ভাই। কথাটা বলে পায়ে পায়ে চলে এলাম আমার নিজের ঘরে।

সেই চিঠিটায় আমার সারা জীবনের ভাবনা রয়েছে। আনিস নতুন কথা লিখেছে। আর সে কথার পর আমার আর কোন কথা থাকবার নয়।

"মঞ্জু, তোমার চিঠি পেয়ে উত্তর লিখছি। কিছুদিন ধরেই আমি একটা কথা বলতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি। নানা রকমের চিন্তা, নানা রকমের সমস্যা আমার চোখের সামনে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বাবা মারা যাবার পর আমি নতুন করে বিচার করলাম সব কিছু। আর বুঝে দেখলাম, এই প্রথম অনুভব করলাম—এ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই।

তুমি তো জানো, মানুষের মন বড় বিচিত্র। আমাদের জীবনের চারপাশে এতো জটিলতা, এতো সমস্যা, এতো সংকট যে একেক সময় আমরা নিজেদেরও চিনে উঠতে পারি না। আমি কোনদিন ভাবিনি তোমার কথা আমায় এমন গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। ঢাকা থেকে ফিরে এসে তোমায় দেখে আমার যখন ভালো লাগলো তখনও না। কেন না তখন পর্যন্ত তুমি সুন্দর বলেই

তোমার দিকে হাত বাড়িয়েছি। আমি আর দশজন পুরুষ মানুষ থেকে আলাদা ছিলাম না। পরে আমার এ মনোভাব আমি বিচার করে দেখছি।

হ্যাঁ তুমি দেখতে সুন্দর এটাই যেন মস্ত আকর্ষণ ছিলো আমার কাছে। তোমাকে যে হাতে স্পর্শ করেছি, তখন সেটা ক্লেদাক্ত লোভী হাত। জানি না তুমি তা টের পেয়েছো কি না।

তারপর আমি পালাতে চেয়েছি আমার সেই লোভ থেকে, আমার নিজের ব্যক্তিত্বের আত্মাবমাননা থেকে। কিন্তু পালাতে চাইলেই তো আর তা পারা যায় না। আমি চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি।

যখন জানলাম পারবো না, তখনই আমার কাছে বড় হয়ে উঠলো বাইরের লোকের সমালোচনা। কিন্তু সেটাও হয় তো অস্বীকার করতে পারতাম। কিন্তু আরো বড় হয়ে দেখা দিলো আমার নিজেরই মনের শিক্ষিত সংস্কার। বারবার নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি, এ আমি কি করলাম। যে পথে কোনদিন হাঁটতে পারবো না, সে পথের ওপর পা রাখলাম কেন ?

দিনের পর দিন ভাবলাম। যুদ্ধ করলাম নিজেরই সঙ্গে। চেষ্টা করলাম তোমার কথা না ভেবে থাকতে, কিন্তু পারলাম না। তোমাকে নিজের থেকে আলাদা ভাবতে গেলেই নিজেকে ভয়ঙ্কর শূন্য লাগ[illegible]। দিনের পর দিন ঢেউয়ের জল সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম, আ[illegible] সেই বিপুল আর অজস্র জলের ঢেউ আমাকে আচ্ছন্ন করে দিতে চাইলো। এ যে কি যন্ত্রণা কেমন করে বোঝাবো ! অবশেষে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে হলো। এ ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছনো সম্ভব ছিলো না আমার পক্ষে।

মঞ্জু ভুল বুঝো না। আবেগের মুখে যেমন দু'টি মানুষ পরস্পরের কাছাকাছি এসে বলে, ভালোবাসি—আমার এ সিদ্ধান্ত তেমন আবেগের মুখে আসেনি। কেন না আবেগের সেই তীব্র যন্ত্রণার মুহূর্তগুলো অতিক্রম করে আসার পরও আমি ভেবেছি। চিন্তা করেছি। আর

বারবারই আমাকে একই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে হয়েছে। আমি বেঁচে থাকতে চাই।

এমন কথা বলি না যে, তোমাকে জীবনের কাছাকাছি না পেলে আমি বাঁচবো না। আজীবন আকাঙ্ক্ষা করেও মানুষ কোন জিনিস পায় না, এবং তারপরও বেঁচে থাকে। কিন্তু বেঁচে থাকা এক আর সুন্দর ভাবে, জীবনকে ভালোবেসে বাঁচা অন্য কিছু। জীবনে তোমাকে না পেয়েও আমি বাঁচবো। কেন না বেঁচে থাকাটা আমাদের জীবনের স্বাভাবিক অভ্যাস। কিন্তু সেই বাঁচায় আমার লাভ কী! সব আনন্দ সব সুখ, সব সাধ যদি আমার মরে যায় —তাহলে নিঃশ্বাস নিয়ে আর কতগুলো খাদ্য চিবিয়ে বেঁচে থাকায় কী লাভ? এ সিদ্ধান্তে এসেও আমি অপেক্ষা করেছি—কেমন করে তোমাকে এ সিদ্ধান্তের কথা জানাবো। আবেগের মুখে তোমাকে যে-ভাবে জেনেছি সেটা আমার সব জানা নাও তো হতে পারে। তোমাকে সম্পূর্ণ ভাবে জেনেছি—এমন বিশ্বাস তখনও মনে আসেনি। আর সে জন্যেই আমি সারা মনে ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেছি।

সেবারে গিয়ে দেখে এলাম—তুমি আমার চেয়েও অনেক বেশী ভেবে বসে আছো। তোমার মা, আকরাম, বেনু—এদের দেখেছো, আর ঘৃণায় কষ্ট পেয়েছো! এই অপমান আর যন্ত্রণার মুহূর্তগুলো অতিক্রম করতে করতে নিজেরই অলক্ষ্যেই কি না কে জানে তোমার মনের ভয়, দ্বিধা, সন্দেহ সব বাধা পার হয়ে সিদ্ধান্তের শক্ত ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছো।

তারপর বাবার মৃত্যু। সে মৃত্যু যে স্বাভাবিক মৃত্যু ছিলো না, বাবাকে হত্যা করা হয়েছিলো—তা তোমার মুখ দেখেই বুঝেছিলাম আমি। এবং তখনই লোভের আর বিকৃতির শেষ সীমানার সঙ্গে পরিচয় হলো। বুঝলাম আমার সুখ সাধ আর ভালোবাসাকে যদি হত্যা করি, তাহলে হয়তো আমিও শেষে অমন বিকৃত হয়ে যাবো। তোমার মা'র ওপর প্রথম প্রথম ঘৃণা হয়েছিলো আমার। পরে আমার

দুঃখ হয়েছে। জীবনে সুন্দরকে যে খুঁজে পায়নি, চেষ্টা করেও সে কেমন করে সুন্দর হবে, সুস্থ হবে।

জানো, আমার সব ভাবনার মাঝখানে ছড়িয়ে রয়েছো তুমি। মাঝে মাঝে এতো দেখতে ইচ্ছে করে!

কি ভাবছো জানতে দিও।—আনিস।

চিঠিটা পড়েছি বারবার। আরো কতগুলো পারিবারিক খবরাখবর ছিলো। আমি সেগুলোর কোন গুরুত্ব দিই নি। এই অংশটুকু নিয়েই ভেবেছি। প্রথমে কান্না পেয়েছিলো আমার ক্ষোভে। আনিসকে এতো সাধারণ আর ছোট ভাবতে আমার অশেষ কষ্ট হচ্ছিলো। বার বার প্রশ্ন তুলেছি—কেন এতো কথা লিখলো আনিস, কি দরকার ছিলো। তারপর আবার পড়লাম। তারপর আবার। আর ধীরে ধীরে, একটু একটু করে বুঝলাম, আনিস নিজের মনকে খুলে ধরেছে। নিজের ভুল-ত্রুটি সংশয় সন্দেহ—সব কিছু লিখে জানিয়েছে। এতোখানি আপন তো কোন মেয়ে হতে পারে না সহজে। চিঠিটা এতো সুন্দর লাগলো তখন। নির্জন ঘরে অস্ফুট স্বরে, শুধু নিজের মনকে শুনিয়ে শুনিয়ে ডাকলাম, আনিস, তুমি এতো সুন্দর হ'লে কেমন করে!

আমার এখন শুধু লেখা। কোন কাজ নেই হাতে।

আনিসের ওখান থেকে রাহুল এলো। ওর হাতে টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে আনিস। নিজে আসতে পারবে না। কয়েকদিন পরই ওকে লাহোর চলে যেতে হবে মাস কয়েকের জন্যে।

বাবার ফাতেহা হলো। কয়েকটা দিন বেশ কাজে কাজে গেলো। তারপর আবার সেই নিরুদ্বেগ নিঃস্রোত জীবন। ছোট আপা বৈরুত থেকে চিঠি লেখেছে এরই মাঝখানে। লিখেছে, মঞ্জু রে আমার সব চাওয়া যদি পূর্ণ হতো, তাহলে আমি এতো দূর আসতাম না। আমি

দেশে ফিরে গিয়ে এরপর ভালো চাকরি করবো, উঁচু সোসাইটিতে মিশবো। কিন্তু আমার যে বড় সাধ ছিলো সুখী হবার সে কথা কোন মতে ভুলতে পারি না।

চিঠি পড়তে পড়তে ছোট আপার দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। বিদেশে আসার জন্যে স্বাস্থ্য আর যৌবন থাকলে মেয়েদের যা যা করতে হয়—আমাকেও তা করতে হয়েছে। কতখানি নরকে নামতে হবে জানতাম। তবু আমি করেছি। এও নিজেকে হত্যা করা। সবচেয়ে কি আশ্চর্য জানিস, যে আমাকে নিয়ে পুতুল পুতুল খেলছে—সেই আমাকে এখন ঘরের স্বপ্ন দেখায়। মঞ্জু রে, সেইখানে যে আমার সব চাইতে বড় অপমান। আমার মতো ভুল তুই করিস না। জীবনকে সুন্দর করে তুলিস, যে কোন মূল্যেই হোক।"

কেউ জানতো না ছোট আপা কোথায়। বাবার অসুখের টেলিগ্রাম ছোট আপার হাতে পৌঁছায় নি। তার অনেক আগেই ছোট আপা বিদেশ গিয়েছে। বাবার মৃত্যুর খবরও বোধ হয় জানে না। ছোট আপাকে সব খবর জানিয়ে চিঠি লিখলাম।

আর লিখলাম আনিসকে। লিখলাম, আমার সব ভাবনা, সব চিন্তা থেকে ছুটি নিয়েছি। আমি আর কিছু জানি না। জানি শুধু তোমাকে। আর কিছুই ভালো লাগে না আমার। কবে আসবে?

রাহুল ফিরে গেলো পাবনা। আবার আমার একাকী সময়। বই আর খাতা নিয়ে সময় কাটাই। মাঝে মাঝে দুঃখ হয়, কেন লেখা-পড়া শিখলাম না। দু-একটা পাশ থাকলে তবু যাহোক কিছু কাজটাজ করতে পারতাম। পাশ না থাকলে তো আর চাকরি পাওয়া যায় না। আর কী অসহ্য লাগে একেক সময়!

কিন্তু কে জানতো এই সময়টুকু স্রোতের শুধু বাঁক ফেরা স্তব্ধতা। গভীর প্রবাহে আছড়ে পড়ার আগের মুহূর্তটুকু, যখন

ওপরের স্রোত অচঞ্চল অথচ ভেতর ভেতর তীব্র টানে টানছে অনেক নীচের মাটি।

আমার দু'চোখ ভরে এতো দেখবার আর ভালোবাসবার সময়টুকু মেঘলা আকাশে একটি তারার আলোর মতো একাকী আর স্বল্প।

আকরাম দোকান দেখতো আর এ-বাড়িতে রাতে থাকতো। এমনি বেশ কিছুদিন গিয়েছে। এখন আসে না নিয়মিত। মাঝে মাঝে আসে। দোকান থেকে যে টাকা দিতো আগে, আজকাল আর তা দেয় না। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনতে হয়। ইন্‌সিওরেন্সের টাকাটা পেতে দেরি হবে। পোষ্টাপিসের এ্যাকাউণ্ট এখন সব ব্যাঙ্কে জমা হয়েছে।

ক'দিন ধরেই শুনছি, আকরাম নতুন ব্যবসায়ে হাত দেবে। তার জন্যে টাকা দরকার। দোকান থাকবে বেনুর হেফাজতে আর আকরাম নামবে ব্রিক ফিল্ড করতে।

দোকান থেকে কিছু টাকা পাওয়া গেছে, এখন বাকী হাজার দশেক পেলেই আরম্ভ করতে পারে ব্যাবসাটা। মাকে বুঝিয়েছে, দেখো না মোটে তো একটা সিজ্‌ন, দেখো তোমার দশ হাজারই পনেরো হাজার হয়ে ফিরে আসে কি না।

আমি ওদের পরামর্শ শুনেছি। মা ইতস্ততঃ করেছে একটু একটু। আর সেই অবকাশে মম আর পুতুলকে মা'র সামনে এনে ধরেছি; বলেছি, টাকা বাড়াবার চিন্তা না করে এদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা চিন্তা করো, তা হলেই ভালো কাজ হবে।

মা দেখেছে মম আর পুতুলকে। মনে মনে কষ্ট পেয়েছে—এও ঠিক। কিন্তু আমি জানি মা'র এমন শক্তি নেই যে ওকে টাকা না দিয়ে পারে। আকরাম কয়েকদিন এলো না, আর মা ওর খোঁজে লোকের পর লোক পাঠালো। দিনের পর দিন ঘর-বার করলো। উদ্‌ভ্রান্ত হলো। কয়েক দিন পর আকরাম নিজেই এলো। এসে বললো, আমি অন্য জায়গা থেকে টাকা পাচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা।

মা সেই রাতেই আট হাজার টাকার চেক কেটে দিয়েছে।

মা এখন আকরামের জন্যে সব করতে পারে। হ্যাঁ, সব। শরীরের আবেগ আর উল্লাসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে একটা উৎকট চেষ্টা রয়েছে মা'র। আর সে জন্যই মা আকরামের পায়ে সব কিছু ঢেলে দিয়ে বসে আছে।

টাকাটা ফিরে এলো না। ইঁট কাটা হলো, কিন্তু পোড়াবার অনেক আগেই নাকি বৃষ্টিতে ইঁট গলে ক্ষতি হয়ে গেলো। মা শুনলো। ব্রিকফিল্ড বন্ধ করে দাও, বললো!

কিন্তু তখন আর পিছিয়ে আসবে কি! পেছোবার উপায় থাকলে তো? টাকাটা অমনি অমনি গেলো। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম দূর থেকে। বাবা অতি কষ্টে টাকা জমিয়েছিলেন। সেই টাকা নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলা হবে যদি জানতেন?

তারপর দোকান। বাবার দোকানে ফিরে এসেছে আকরাম। এই মাস-দুয়েক ছিলো বেনু। এখন দু'জনায় দিনরাত খিটিমিটি লেগেই আছে। আকরাম এসে জোর গলায় চিৎকার করে এ-বাড়ীতে। বলে, বেনু ধ্বংস করে দেবে দোকানটা। আজকাল ও জুয়ার টেবিলে অনেক টাকা পয়সা নষ্ট করছে, দোকানে কোন ষ্টক নেই।

এরই মাঝে মা'র সাথে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেলো আকরামের। মা গালাগালি দিয়ে যেতে লাগল, আর আকরাম গজরাতে লাগলো ঘরের ভেতরে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে শুনলাম। সে রাতে ঠিক বুঝতে পারি নি। পারলে কি আর আমাকে বিপদে পড়তে হয়। যদি বুঝতাম আমাকে নিয়েই এতো ঝগড়ার সূত্রপাত।

আকরাম গোঁয়ার লোক। ধীরে কাজ করে না। সে জন্যেই বোধ হয় বোকা আর নিষ্ঠুর।

একদিন সকালে হঠাৎ আমার কাছে এসে বললো, আজকে চল, আমার বাড়ীতে তোরা বেড়িয়ে আসবি।

আমি মাথা নাড়লাম, না, আজ নয়। অন্য কোনদিন দেখা যাবে। আকরাম আহত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে সেদিন বিদায় নিয়েছে। ওর অমন দৃষ্টি আমি কোনদিন দেখিনি। সেদিন নিঝুম দুপুর, ঘরের মেঝেতে শানের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমের মাঝখানেই হঠাৎ মনে হলো, কেউ যেন আমাকে চেপে ধরেছে। জেগে উঠেই ধড়মড় করে উঠতে গেলাম। পারলাম না। তখন আমার ঘুমের ঘোর কেটেছে আর আমি চিৎকার করে উঠেছি প্রাণপণে। আমার দু' কাঁধের ওপর দু' হাত রেখে জোর করে মেঝেতে ধরে রাখতে চেষ্টা করছে আকরাম। আমি প্রাণপণে চিৎকার করছি আর নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছি।

কোথা থেকে কি হলো জানি না। বাইরে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেলো এবং ঘরের ভেতরে কেউ যেন এলো। তার একটু পরই আকরাম আর্তনাদ করে গড়িয়ে পড়লো। আমি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছি। দেখি আমার সামনে ঘুম-ভাঙ্গা চোখে মা দাঁড়িয়ে, সঙ্গে বেনু। ওর হাতে কয়লাভাঙা লোহাটা।

বেনু তখনও আপসাচ্ছে রাগে। আমি এদিকে থরথর্ করে কাঁপছি। ওদের দিকে তাকাবার মতো অবস্থা ছিলো না আমার।

আঘাতটা জোরে দেয়নি বেনু। জখম হয়েছে সামান্য। বেনুই আকরামের মাথায় পানি ঢেলে ওকে সুস্থ করে তুললো। একটু পর জ্ঞান ফিরলো আকরামের। উঠে বসলো।

মা গালাগাল দিয়ে চললো একটানা। বললো, বলে দিইনি ওসব এখানে চলবে না। বেরিয়ে যাও এ বাড়ী থেকে। তোমার মুখ দেখলেও পাপ হয়। ছোট লোক, কুকুর কোথাকার!

থেমে থেমে বললো মা, আমার সর্বনাশ তো করছো, এখন মেয়েটার জীবনও নষ্ট করতে চাও!

বেনু জোর গলায় হেসে উঠলো। ওর গলায় বিদ্রূপ। বললো, এ যাত্রা বেঁচে গেলি, পরের বার কিন্তু হাতটা বেসামাল হবে না।

আকরাম চলে গেলো। কতগুলো টাকা, আর দোকানটা শেষ করে ও চলে গেলো। আর তখন মা'র সর্বগ্রাসী পিপাসা শান্ত হয়েছে। মা আজকাল কেবল কাঁদে। টাকা পয়সার বড় অভাব। বেনু কোনদিন টাকা দিয়ে যায়—কোনদিন যায় না। একেকদিন উনুনে হাঁড়ি চড়ে না।

এ সংকট বাড়লো একদিন দু'দিন করে। এ কাউকে দেখানো চলে না। বোঝানো চলে না। যদি আমার হাতের দু'গাছি চুড়ি বিক্রি করতে হয় কিম্বা কারু কাছে হাত পাততে হয়—তা'হলে সেটা চারপাশের পরিচিত আর দশটা ঘটনার মতোই মামুলি মনে হবে। কিন্তু এ ঘটনার ভেতরকার যে জ্বালা রয়েছে, যে নিঃস্ব অসহায়তা রয়েছে, তা শুধু দেখে বোঝা যায় না।

অভাব দারিদ্র্য এ সব কতো পরিচিত শব্দ। কিন্তু ক্ষুধা—সেই ক্লান্তিকর অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ সময়টাকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে অতিক্রম করে যাওয়া অথবা ধৈর্যের শেষ ধাপে পা রেখে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনুভব করা, কেমন করে আমার সমগ্র চেতনা হলুদ একটা গুহার মধ্যে নেমে যাচ্ছে, আর যতোই নেমে যাচ্ছে ততই গভীর অবসাদ শরীরের পেশিতে পেশিতে ছড়িয়ে যাচ্ছে, দেহের প্রতিটি গ্রন্থি শিথিল হয়ে যাচ্ছে স্বাদহীন, বর্ণহীন নিরবধি একটা ধূসরতায়—এই ক্ষুধাকে চিনতাম না, বুঝতাম না। সুস্থ অবস্থায় যে ক্ষুধাকে বোঝা যায় না, এখন সেই ক্ষুধাকে বুঝলাম। মম পুতুলকে ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদতে দেখতাম, কষ্ট হতো আমার প্রথম প্রথম। তারপর এক সময় সেই চেতনাও হারিয়ে ফেলতাম। দশটা স্বাভাবিক ঘটনার মতোই মনে হতে লাগলো।

ঝি আর চাকরটা বিদায় নিয়েছিলো। তবে বেনু ঠিক আসতো। ওরই মারফত আমার দু'টো একটা গয়না বিক্রি করতে পাঠাতাম। গয়না বিক্রির টাকায় কিছুদিন বেশ চলতো, তারপর আবার সেই ক্ষুধা। আবার সেই বাচ্চাদের কান্না! বেনু যে দোকানটা শেষ

করে দিচ্ছে তা বুঝতাম কিন্তু বলবার কোন ক্ষমতা নেই তখন আমাদের। কেমন করে বলবো! ও-ই এখন আমাদের শেষ আশ্রয়।

এরই মাঝখানে চিঠি আসতো আনিসের। অন্য সময় হ'লে যে মা কি হাঙ্গামা বাধাতো বলতে পারি না। একটা কিছু গোলমাল বাধাতো নিশ্চয়ই। কিন্তু এই দুঃখের দিনে মা অন্যদিকে লক্ষ্য রাখে নি। দেখেও যেন দেখতে পায় নি। সেই চিঠি টেবিলে পড়ে থেকেছে। মা আনিসের হাতের লেখা চিনতে পেরেছে, বেনু সেই চিঠি হয়তো খুলেও পড়েছে—দেখেছি তখন ওর মুখে বিচিত্র হাসি ফুটেছে, ঈর্ষায় কালো আর শক্ত হয়ে উঠেছে মুখের ভঙ্গি—কিন্তু কিছু বলেনি। না বেনু, না মা।

একটি মানুষের মধ্যেই যে বাস করে শত শত মানুষ। একজনের ভেতরেই থাকে অনেক কয়টি ব্যক্তি। তা যদি না হতো তাহলে মানুষকে জানবার আগ্রহ থাকতো না আমাদের। কোন পরিবেশে কার যে কোন রূপ ফুটে উঠবে কেউ তা বলতে পারে না। একজনের মধ্যেই অনেক মানুষ বাস করে বলেই তো মানুষ বড় বিচিত্র।

বেনুকে লক্ষ্য করে দেখেছি—আজকাল মাঝে মাঝে ও কিছু যেন ভাবে। মম্-পুতুলের দিকে চোখ পড়লেই ও চোখ ফিরিয়ে নেয়, যেদিনই মমকে পুতুলকে দেখে—সেদিনই কিছু না কিছু খাবার জিনিস ওদের হাতে এনে দেয়।

সব চাইতে অসহায় দেখায় এখন মা'কে। দিনের পর দিন যাচ্ছে মা'র মুখে জীবনের যে পরিপূর্ণতার ছায়া দেখেছিলাম তা যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। মা মাঝে মাঝে কাঁদে। কোন কোন দিন খায় না। দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে। শরীরে রক্ত নেই, চোখ-মুখ হলদে হয়ে এসেছে, হাত পা ফুলে উঠেছে—চোয়ালের শক্ত হাড়টা বিশ্রী রকম জেগে উঠেছে।

এই এ্যাডভান্সড্ ষ্টেজ-এ এসব ভালো লক্ষণ নয়—ডাক্তার সেদিন মন্তব্য করলেন। খুব ভালো নিউট্রিশন দরকার এখন ওঁর। আপনি

দেখবেন একটু নিজের থেকে। নতুন" ডাক্তার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে গেলো।

জীবনের এও এক রূপ। মাঝে মাঝে সোনা বিক্রী করা টাকায় বাড়ীতে যখন দু'দিনের স্বচ্ছলতা আসে তখন আমি ভাবতে বসি। শরীরময় আজকাল এতো ক্লান্তি আমার। সেই সব ক্লান্তির মুহূর্তে একাকী থাকতে ইচ্ছা করে। আর সেই একাকী সময়েই ভাবনাগুলো আসে একে একে। জীবনকে দেখি আর আশ্চর্য লাগে। জীবনের বাইবে ভেতরে কি অদ্ভুত পরিবর্তনের ধারা সব সময় বইছে। আমবা কখনো তা দেখতে পাই না—বোধ হয তা কখনোই দেখা যায না। কোন কোন সময়ে অশেষ শুদ্ধতা নিয়ে যদি লক্ষ্য করা যায় চারপাশে, যদি অনুভব করা যায় চারপাশের ঘটনাগুলোকে তাহলেই বোঝা যায়—তাহলেই চোখে পড়ে—পরিবর্তনের এই সূক্ষ্ম আর ধীর প্রবাহকে।

ক'টা তো মোটে মাস—কিন্তু কী দ্রুত পরিবর্তন ঘটলো চৌধুরী বাড়িতে। আমার চোখের সামনেই দেখলাম পরিচিত লোকগুলো কী রকম বদলে গেলো।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে—কী সেই শক্তি যা আমাদের এমন নিষ্ঠুর হাতে বদলে দিচ্ছে। নিয়তই মানুষের মনকে নতুন থেকে নতুনতর ছাঁচে ফেলছে আর সেই ছাঁচ থেকে অন্য আদলে, অন্য চেহারায় এনে ধরছে চোখের সম্মুখে। এই নাম কি সময়! শুধু কি সময় নামের সেই যাদুকরী শক্তিই সব কিছুর নিযামক। না আছে কোন শক্তি সবারই ভেতরে। যা চারপাশের ঘটনা আর জগতকে বদলে দিচ্ছে, আর সেই রূপান্তরিত জগতই আবার শক্তিমান হয়ে বদলে দিচ্ছে মানুষকে। পরিবর্তনের এই নিরবধি প্রসারকেই হয়তো বলা যায় সময় —কিন্তু কী সেই শক্তি যার এতো লীলা।

যন্ত্রণা, আনন্দ, ক্ষুধা, পিপাসা—তারপর আবার উদার আকাশ, সবুজ গাছপালা, উত্তরোল হাওয়া—শরীরের ভেতরে রক্তে রক্তে কতো

ঝঙ্কার, অনুভূতির গহনে কতো অশেষ গান—আমি সব অনুভব করি আর মুগ্ধ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে আমার। কী বিচিত্র পৃথিবী। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে সব কিছুর অন্তরালে যেন একটি গভীর অর্থ লুকিয়ে আছে, যা আমি জানি না, কোন দিন কেউ জানেনি অথচ যা জানবার জন্যে মানুষ চিরকাল ধরে উন্মুখ হয়ে চেষ্টা করেছে। একেক সময় মনে হয় আমিও যেন কিছু বলতে চাই। আমারও কিছু জানবার আছে।

আমি এই ভাবনার কথা আনিসকে লিখি। ও চিঠি লেখে আরো দীর্ঘতর। লেখে, তোমার এই ভাবনার কথা লেখো না কেন তুমি? উত্তর দিই, না নাম করবার সাধ নেই। যতো তাড়াতাড়ি পারো ফিরে এসো তুমি—কতো দিন দেখিনি। আর কতোদিন? আমার সব সাধের কথা লিখি, কিন্তু কক্ষনো লিখিনি আমার এই ক্ষুধার কথা—এই ক্লান্তির কথা। কেন না জানি, এখানকার অবস্থা জানলে ও ট্রেনিং শেষ হবার অনেক আগেই চলে আসবে উদ্বিগ্ন হয়ে। হয়তো চাকরি ছেড়ে দেবে। তার চেয়ে, তার চেয়ে—এই ভালো।

গভীর রাতে মা'র কান্না শুনি। করুণ কাতরানি ভেসে আসে কোন কোন রাতে। আমার ঘরে শুয়ে শুয়ে শুনতে পাই। আমার ঘুম আসে না সে রাতে। মনে হয় চৌধুরী বাড়ী ভেঙে তলিয়ে গিয়েছে মাটির নীচে। আর সেই ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে যেন কোন অভিশপ্ত আত্মা'র করুণ আর কাতর কান্না ধ্বংসস্তূপের ইঁট বেয়ে বেয়ে উঠে আসছে।

মা নিজেকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বিলাপ করে—এ আমি কি করলাম, আমার বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটোর কি হবে! কোথায় দাঁড়াবে ওরা!

বেনু সে কান্না শুনছে কি না কে জানে। একদিন বেনু আকরামকে ধরে নিয়ে এলো। আকরাম এখন অনেক বদলেছে। ঝকঝকে চেহারা। দামী স্যুট পরনে, পায়ে নজর-পিছলানো জুতো, গলায় রঙীন টাই, চোখে সানগ্লাস। ওর বয়স যেন দশ বছর কমে গিয়েছে। ওর মুখে ছিলো দামী সিগ্রেট। বাড়ীর চারপাশটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। মার ঘরে বসলো কিছুক্ষণ। তারপর চলে গেলো।

ও চলে যাবার পর মা যেন কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে।

কেন এমন হয় জানি না। মাঝে মাঝে মনে হয় মা বোধ হয় বাবার কাছে ভীষণ অসুখী ছিলো। আর সুখ পেয়েছিলো বাইরের এই সব লোকেদের কাছে। আর সে-জন্যেই হয়তো মা আকরামের জন্য সব কিছু করতে পারে।

জটিল, বড় জটিল এই জীবন আর মানুষের মনের এই ভেতরটা।

বর্ষা শেষ হয়েছে সেই কবে এখন প্রকৃতি পরিপূর্ণ। সাদা সাদা মেঘ দেখি আকাশে ভাসতে। আমাদের বাড়ীর দুয়ারে কামিনী ফুলের গাছে অজস্র ফুল ফোটে, সারা রাত গন্ধে গন্ধে মাতাল থাকে হাওয়া। আমি অলস দৃষ্টিতে শুধু দেখি। আর তো কিছু করবার নেই। এখন শুধু অপেক্ষা করে থাকা। নিজের অনেক আশার সাধের ভবিষ্যৎটার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করা।

এমনি দিনে আমার বন্ধুরা আসে। বন্ধু বলতে পাড়ার মেয়েরা। পুরনো জানাশোনাদের মধ্যে আসে তাজিনা। ওর স্বামী তিন বছরের জন্যে বিদেশ গিয়েছে। ও এসে প্রেমের গল্প জমায়। সব ওর নিজের প্রেমের গল্প।

যদি আমি এ-ব্যাপারে কিছু বলেছি তো হেসেছে ও। বলেছে, তুমি অতো সিরিয়াস্‌লি দেখো কেন ব্যাপারটা। আমার স্বামী বিদেশে যে তিন তিনটা বছর কাটাবে, তা কি শুধু ব্রহ্মচর্য পালন করে! নিশ্চয়ই কোন না কোন মেয়ের সঙ্গে ওর জানাশোনা হবে। জীবনের উপভোগটা কি ও বাদ দিয়ে রাখবে! আফট্রা'অল্‌ লাইফ্‌ ইজ্‌ সামথিং টু এন্‌জয়।

এ যুক্তির ওপর ও সিদ্ধান্ত টানে। বলে, তাহলেই দেখো, আমারও শুধু চিঠি লিখে আর চোখের জল ফেলে তিন তিনটে বছর কাটিয়ে দেয়ার কোন মানে হয় না।

ওর কথা শুনে ভয় করে আমার। এমন কথা কেউ বলেনি আমাকে। কোথাও শুনিনি। ইশ কি ভয়ঙ্কর ওর কথা!

রঞ্জুর যে খবর বললো সেটাও অবাক করে দেয়ার মতো। রঞ্জুরা ঢাকায় রয়েছে। ওর চিঠি খুলে দেখায় তাজিনা। সে চিঠিতে ওর বন্ধুদের কথা। সবগুলো এখন পুরুষ বন্ধু ওর। ওর চিঠি পড়ে শেষটা মন্তব্য করে তাজিনা, মেয়েটা ভীষণ বোকা ছিলো এখানে, এবার যদি কিছুটা চালাক হয়।

চেষ্টা করেও আমি চুপ থাকতে পারি না। জিজ্ঞেস করি, তাহলে ওকে যে ভালোবেসেছে—তার কি হবে।

আমার কথায় সে কি হাসি তাজিনার! যেন আমি খুব হাসির কোন কথা বলছি। বললো, অমন প্রেম কে না করেছে দু'চারটা। স্কুল ছাড়াতে ছাড়াতেই একটা মেয়ে কতোবার করে প্রেম করে। ওর তো মোটে একটা—তুমিও যেমন!

ও একেক দিন টেনে নিয়ে গিয়েছে ওদের বাড়ীতে। গিয়ে দেখি কোন কোন দিন চায়ের জম-জমাট আসর বসেছে। একদিন বেনুকেও দেখলাম। তাজিনা সেদিন ওর এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। আমি তো অবাক! এই নাকি বন্ধু! বছর চল্লিশের বিরাট একটা পুরুষ মানুষ। কোথাকার যেন ব্যবসায়ী। এখানে এসেছে দিন কয়েকের জন্য।

মেয়েদের যে পুরুষ বন্ধু হয়, এই যেন প্রথম জানলাম! না, জানলাম না, দেখলাম। গল্পে পড়েছিলাম এতো দিন। এখন দেখলাম সত্যি সত্যি। তাজিনা আমার কাছে যেমন সহজ হতে পারে, একটুতেই গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে—তেমনি সহজ হতে পারে কাসেম সাহেবের কাছেও, তেমনি হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে তার গায়ের ওপর। কথায় কথায়, কারণে অকারণে হাসতে পারে খিলখিল করে।

আমি যতোই দেখি ততই অবাক হই। আশ্চর্যের বিষয় মনে হলো, বেনু ওদের সাথে অনেক দিনের পুরনো বন্ধুর মতো ব্যবহার করছে।

আরো আশ্চর্য ব্যাপার সে ঘরে এতো খিল্‌খিল্‌ হাসি, এতে কথা—কিন্তু কেউ ভুল করেও উঁকি দিয়ে দেখলো না ঘরের ভিতর কি হচ্ছে।

জানলাম একটু পর আরো ভালো করে, কাসেম খান তেল কোম্পানীর চাকুরে। তাজিনার বাবা একটা ফিলিং স্টেশন বসাবেন সেই ব্যাপারে প্রায়ই আসতে হয় ভদ্রলোককে।

ফিলিং স্টেশন কি? একটু আড়াল পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম তাজিনাকে।

ও-মা, জানো না! মেয়েটা আমার অজ্ঞতা দেখে, করুণা করলো যেন। বললো পেট্রল পাম্প-এর আমেরিকান নাম ওটা।

ভদ্রলোকের কথায় আরো অনেক বিদেশী শব্দ ছিলো। কতক বুঝলাম, কতক বুঝলাম না। আমি জানতাম মোটর গাড়িকে আটোমবিল বলে, ভাড়াটে ট্যাক্সির নাম ক্যাব, পুলিশের নাম ক'প। আরো যেন কি কি সব শব্দ।

আই'ড্ লাইকটু গেট য়ু এ পিক্‌নিক্ দ্য মোমেন্ট আই গেট থ্রু মাই জব হিয়ার আই'ল জাম্প আপন্ এ ক্যাব এন্ পিক্ য়ু অল্ আপ্।

এই নাকি ইংরেজী! তবু তো এ অংশটুকু বোঝা যায়। এমন ইংরেজী কিন্তু খবরের কাগজেও থাকে না। আমার হাসি পাচ্ছিলো ভীষণ। কাসেম সাহেবের কালো আর মোটা মোটা ঠোঁট আর শক্ত মাংসল ঘাড় থেকে যেন শব্দগুলো খসে খসে পড়ছিলো। দেখছিলাম ভদ্রলোক গলা খুলে হাসছেন আর আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। তারপর হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎ দেখলাম ভদ্রলোকের চোখ দুটো। আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম মনে মনে। সেই হাসি আর উল্লাসের মাঝখানে কেন জানি না আমার ভয় লাগলো। ভদ্রলোকের চোখে কি বিশ্রী রকমের একটা আবিলতা। মানুষের নজরেও যে গা ঘিন্‌ঘিন্ করে ওঠা নোংরামি থাকতে পারে—এই প্রথম দেখলাম।

একটু পর আবার হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। আমাকে ডেকে বললেন, তুমি আসতে পারবে না?

না, না আমি কেন আবার, আমি বিব্রত হয়ে উঠেছি তখন।

হ্যাঁ হ্যাঁ যাবে ও। কেন যাবে না। আমি যখন যাচ্ছি, তুলু ভাবী যখন যাচ্ছে—তখন ও যাবে না কেন ?

বেনুও হেসে হেসে বলেছে দূর থেকে, যাবে না কেন। নিশ্চয়ই যাবে। ও তো বাইরে বেরুবার সুযোগই পায় না আজকাল।

আমি সেদিন বাড়ীতে ফিরলাম অনেকটা সহজ আনন্দ নিয়ে। আজ বহুদিন পর একটু হেসেছি। হাল্কা মন নিয়ে বাড়ী ফিরে বহুদিন পর আমার সেদিন ভালো লাগলো। মনের ভেতর কোথায় যেন একটুখানি অস্বস্তি খচ্ খচ্ করছিলো। সেটা হয়তো কাসেম সাহেবকে ঠিক বুঝতে না পারার জন্যে। কিন্তু মানুষকে অত সহজে আর কেই বা বুঝতে পেরেছে কবে। আজকের এই বিকেলটা আমার ভালো লাগলো, এই তো যথেষ্ট। ওদের মধ্যেকার যে অস্পষ্ট সম্পর্কই থাক, তাতে আমার কি ?

যদি তেমন মনে করি তো না হয় যাবো ওদের সঙ্গে পিকনিকে। কতো দিন আমি বাইরে যাই না।

হায়রে ! যদি না যেতাম। তখন বুঝেও যেন বুঝতে চাইনি। আমার ভেতরে যে হ্যাংলা মেয়েটা রয়েছে সে-ই আমাকে নিয়ে গিয়েছে। সেই মেয়েটা, যে একটুতেই অবুঝের মতো খুশি হয়ে উঠতে পারে, লোভে হাত বাড়াতে পারে—সেই আমার সর্বনাশ করলো। যদি জানতাম, যদি জানতাম !

আনিসের চিঠি এলো আবার। ও লিখেছে, রাহুলের কাছে বাড়ীর সব খবর পেলাম। আমার ট্রেনিং শেষ হয়ে এলো। এ মাসের শেষেই ফিরছি। কি আনবো তোমার জন্যে ?

আনিস আসবে। আমার সারা মন খুশিতে ছলছল করে উঠলো। এ যেন জীবনের সব চাইতে পরম সার্থকতার জন্যে অধীর হওয়া। আমার সারা মনে গান হয়ে বাজতে লাগলো তার আসার খবর। রাতে আমার ঘুম এলো না সেদিন, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশটাকে দেখলাম। আনিস আমাকে চিনিয়ে দিয়েছিলো আকাশের কতকগুলো

তারাকে। সবগুলোকে খুঁজে খুঁজে বার করলাম। উত্তরের সেই গ্রেটবিয়ার, মাঝ আকাশের ক্যাসিওপিয়া, পূব আকাশের অরিয়ন, তার পাশে গ্রেট ডগ আর একপাশে রক্তিম উজ্জ্বল অরাগল।

কিন্তু সব ছাড়িয়ে দৃষ্টি বারবার গিয়ে পড়লো স্কোর্পিও নক্ষত্রের উপর। বৃশ্চিক রাশির দাড়া দু'টো স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কে জানে কেবলই মনে হতে লাগলো সারা আকাশে বুঝি একটি কাঁকড়া বিছে তার বিশাল বিষাক্ত দাড়া দুটো ছড়িয়ে দিয়েছে কোন কিছুকে ধরবার জন্যে।

সেই প্রকাণ্ড আকাশ আর নিঃশব্দ রাত্রি—মাঝখানে একা আমিই জেগে। আমার সেই জেগে থাকা নিঃস্ব সময়ে এক সময় আমি আনিসকে ভুলে গেলাম। ওর চিঠির কথা মনে এলো না। কেবলই মনে হতে লাগলো কাঁকড়া বিছেটা ক্রমেই যেন স্পষ্ট হচ্ছে, ক্রমেই যেন নীচে নেমে আসছে আর যতোই নীচে নামছে ততই তার বিশাল দাড়া দুটো আরো বড় হয়ে উঠছে।

জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। সরে এলাম বিছানার কাছে। শিয়রের জানালার কাছ থেকে দেখলাম অরাগল নক্ষত্রটাকে। শুয়ে শুয়ে এককে বার বৃশ্চিক রাশির ছায়াটা ভাসতে দেখলাম চোখের ওপর। আমি নজর ফিরিয়ে নিলাম আকাশের দিকে। চেয়ে থাকলাম সেই রক্তিম আর উজ্জ্বল অরাগল নক্ষত্রের দিকে। একটি তারার দিকেই তাকিয়ে তাকিযে আমি ডাকলাম, আনিস আনিস! আমার ঘুম পাচ্ছে না কেন?

সেই তারাটা ক্রমে লাল হতে হতে একটি রক্ত বিন্দুর মতো হয়ে গেলো। সেই রক্ত বিন্দুটা আমার চেতনায় জেগে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর আমি এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

বেনু আজকাল কম আসে। যখন আসে তখন দু' পাঁচ টাকা দিয়ে যায় মা'র হাতে। সে টাকা খরচ হয় মা'র জন্যে ওষুধ-পত্তর কিনতে। মম পুতুলের দুধ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বেনুকে সে কথা

মা জানালো। বেন্নুর সেকি রাগ! বললো, আমি যে তোমাদের টাকা দেবো তাতে আমার কি লাভ?

মা কাতরাতে কাতরাতে বললো, বেন্নুরে তুই আজ এ কথা বলছিস।

হ্যাঁ আমিই এ কথা বলছি। আজ একটা বছর ধরে তোমাদের সংসার দেখাশোনা করছি, তাতে কী লাভ হয়েছে আমার? একটা ভাঙা দোকান কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিলে, সেই বোঝা টানতে টানতে প্রাণান্ত হয়ে গেলাম।

তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই বাবা। মা'র অস্ফুট কাতর স্বর শোনা যায়।

আমি ছাড়া কেউ নেই! বেন্নু বিদ্রূপ করে বাঁকা মুখে। বলে, কেন তোমার ছেলে রয়েছে তো! যার সঙ্গে তোমার মেয়ে পীরিত জমিয়েছে!

মা চুপ করে গেলো। আমি শুনলাম। একটু পর বেন্নু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

আমি বুঝতে পারি না কেন বেন্নু আমার সঙ্গে আজকাল খুব ভালো ব্যবহার করে। ওর অমন সুন্দর আচরণ দেখে মাঝে মাঝে মনেও থাকে না যে ও এক সময় আমার দিকে লোভী হাত বাড়িয়ে ছিলো। ওর জন্যে একেক সময় আমার কষ্ট হয়। সত্যি তো, ওর দোষ তো কিছু নেই। স্বাভাবিক মানুষের মতোই ও লোভী হয়েছিলো। মাঝে মাঝে আমার কেমন যেন মনে হয় ওর একটা সচেতন মন রয়েছে আমারই কাছে পড়ে। এ জন্যে নিজেকে সময় সময় এতো অপরাধী মনে হয়!

ও কখনো বলে মাথা নীচু করে, তোর রাগ আজো পড়লো না আমার এই এক দুঃখ থেকে গেলো চিরকালের জন্যে।

কখনো বলে, মানুষ কি চিরকালই এক রকম থাকে? যদি জানতাম আনিসের সঙ্গে তোর কোন রকম সম্পর্ক হয়েছে তাহলে

কি আমি তোর কথা এমন করে ভাবতাম! ভাবতাম না, ভাবলেও তোকে অন্ততঃ টের পেতে দিতাম না। আমিও বুঝি মঞ্জু, ভালো-বাসা কাকে বলে।

আমি শুনেছি ওর কথা। আর দেখেছি কেমন মাথা নীচু করে আসে, কেমন করে চুপচাপ চলে যায়। কখনো সহজ স্বরে বলে। মঞ্জু লক্ষ্মী বোনটি, যদি এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস।

আমি অবাক হয়ে যেতাম। ভালো লাগতো আমার। কিন্তু তবু সংশয় যেন জেগে থাকতো। আর তার কারণ ছিলো চোখ দু'টো। কি বিষণ্ণ অথচ তীব্র সে চাহনি। যেন কোন পশুর চোখ। দেখি আর মাঝে মাঝে চমকে উঠি আমি। তারপর আবার নিজেরই মনে ভেবেছি, এ হয়তো আমারই মনের ভুল। ওর সম্বন্ধে আমার পুরনো ধারণাগুলো মরে যায় নি বলেই আমি ওকে সহজ-ভাবে গ্রহণ করতে পারছি না। যা দেখছি, ভুল দেখছি।

কিন্তু মনের সেই সংশয়ও যে স্থির বিশ্বাসে দাঁড় করাতে পারি না। আর সেই জন্যই হয়তো রেনু যখন আমার সঙ্গে কথা বলতে আসে আমি ওর সঙ্গে কথা না বলে পারি না। আবার ও চলে গেলে তখন ভাবতে বসি, কেন এমন ভাবে কথা বললাম।

আর যদি বা এড়িয়ে যাই ওকে, তখন ও চলে গেলে ভাবতে বসি, কেন ওকে এড়িয়ে গেলাম। ওর সঙ্গে কথা বললে ক্ষতিটা ছিলো কোথায়? আমি এতো দুর্বল কেন?

আমি সহজ হতে চাইলাম এইবার। শেষবারের মতো।

মা'র রোগার্ত দীর্ঘশ্বাস শুনি। মা বলে, আমি আর বাঁচবো না রে মঞ্জু, তুই মম আর পুতুলকে দেখিস।

তাজিনা আসে মাঝে মাঝে। গল্প করে। ওর সেই পুরনো গল্প। ওর দুলু ভাবীকে নিয়ে এসেছিলো একদিন। মহিলার একটু বয়স হয়েছে। কিন্তু মোটে বোঝা যায় না। ভারী সুন্দর করে সাজতে পারেন মহিলা।

মার সঙ্গে অনেক গল্প করলেন মহিলা। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব জমাবার চেষ্টা করলেন। যাবার সময় বললেন, চলো একদিন পিক্‌নিক্‌ করে আসা যাক।

মা শুনে শুধু সপ্রশ্ন-চোখ তুলে চাইলো। আর দুলু ভাবী হেসে বললো, না, না, ভাববেন না কিছু। দিনে দিনেই ফিরে আসবো। আপনাদের বেবুও যাবে সঙ্গে, তাছাড়া তাজিনা ত' আছেই।

আমি জানি না আজ আমার মতো অবস্থায় অন্য কোন মেয়ে কী করতো। এ ডায়েরী লিখছি মোটে কটা মাস ধরে। কিন্তু কতো অদল-বদল ঘটলো আমার ধারণার। কতো পারিবর্তন দেখলাম আমার দু'পাশে। দেখলাম আর ভাবলাম, এই বোধহয় চরম ঘটনা ঘটে গেলো আমার জীবনে। কিন্তু দেখেছি ঘটনার পরও ঘটনা আছে। জীবনের শেষ কথা বলে কিছু নেই। কোন এক সময় ভেবেছি আমি কী করবো এরপর? কোন পথ খুঁজে পাইনি। ভেবেছিলাম আমার জীবনের আশ্রয় শেষ হয়ে গেলো, বাঁচবার আর পথ খোলা নেই। কিন্তু তবু দেখছি আমি ঠিক বেঁচে রয়েছি। আর দশজনের মতো ঠিকই চলে ফিরে বেড়াতে পারছি, আমার মনও ঠিকই কাজ করে চলেছে। দাদুর মৃত্যুর পর ভেবেছিলাম, এই শেষ হলো আমার জীবনের সব চাইতে চরম ঘটনাটি। পরে দেখলাম, না, তারও পরে ঘটনা আছে। আনিস যখন আমাকে জাগিয়েছে, তখন সেই জাগার লগ্নে ভেবেছি, এটাই তো আমার জীবনের সব চাইতে বড় ঘটনা। আমি সুখী হতে চেয়েছি সেই জেগে ওঠার পর থেকে। তারপর আকরাম আর মার সম্পর্ক, বাবার মৃত্যু—একের পর এক ঘটনাগুলো ঘটলো। দেখলাম চৌধুরী বাড়ি ভেঙে পড়লো আমার চোখের সামনে। তবু আমি বেঁচে গেলাম। বাবা মরলো, মা থেকেও সেই কবেই মরে গিয়েছে। মম পুতুল মরে যাবে—শুধু বাঁচলো আনিস, বাঁচলাম আমি

আর বাঁচলো রাহুল। আনিস রাহুল হয়তো অনেক আগেই এ বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিলো বলেই বাঁচতে পারলো। কিন্তু আমি? আমি এই বাড়ীর প্রতিটি তুচ্ছ মুহূর্তেও জড়িয়ে ছিলাম। সব ঘটনা ঘটে গিয়েছে আমারই চোখের সম্মুখে। সব দেখেও, সব জেনেও আমি বেঁচে গেলাম। আমার মনে হয় এই ধ্বংসের স্রোত থেকে কোথায় যেন আমি কিছুটা দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম নিজেকে। সেই জন্যেই ওদের আর সবার থেকে সরে থাকতে পেরেছি। কিন্তু এখন! সেই ধ্বংসের স্রোত থেকে গা বাঁচিয়েও তো নিজেকে বাঁচাতে পারলাম না।

আমার জোর ছিলো একটাই। জীবনকে আমি সুন্দর করে গড়ে তুলতে চেয়েছি। বারবার আমি প্রার্থনা করছি—আমি শুভ্র হবো, আমি সুন্দর হবো।

জীবনের কাছে আমি বরাবর হাত পেতেছি। বেঁচে থাকবার জন্যে। সব সুখ সব সাধ নিয়ে সফল হয়ে ওঠার জন্যে আমি বরাবর ছুটে গিয়েছি আনিসের কাছে। কেন না জানি, আনিসই আমাকে বাঁচতে বলবে। ওরই কাছে রয়েছে আমার সেই সাহস।

আমার কতো সাধ ছিলো আনিসকে পাবার। আনিস ফিরে আসছে আমার কাছে। কিন্তু আমি কি আর পারবো ওর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতে মনের সেই জোর নিয়ে। যে আমাকে বাঁচতে বলেছে, যার কাছ থেকে আমি মনের সেই জোর পেয়েছি—তাকে হারিয়ে আমি বাঁচবো কেমন করে!

আমার সব গেলো। যে শক্তি নিয়ে, যে সাহস নিয়ে আমি বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি এতকাল—সেই শক্তি নিয়ে আমি ওদের রুখতে পারলাম না। নিজে রইলাম স্থির আর একাগ্র হয়ে—কিন্তু তাতে ওদের তো কোন অসুবিধা হ'ল না। আমাকে আমারই ভেতরকার আর কোন একটা সত্তা দুর্বল করে রেখেছিলো। অনেক আগেই সেটা

আমাকে হারিয়ে দিয়ে বসে আছে। অথচ আমি তো জানতাম না। সেই সত্তাটা লোভী, সেই সত্তাটা হিংসুটে। সেটাই আমাকে বারবার করে বাইরের লোভ দেখিয়েছে।

আমি ওদের ওপর প্রতিহিংসা নিতে পারি। কিন্তু তাতে আমার লাভ কি? আনিসকে তো আর ফিরে পাবো না। আনিসও তো মানুষ, তারও তো ঘৃণা আছে। তারও তো ঈর্ষা আছে। আর সেই ঘৃণা আর ঈর্ষা যদি কোনদিন জেগে ওঠে—তাহলে আমি দাঁড়াবো কোথায়?

আজ ক'দিন হলো আমি ভাবছি। কিন্তু কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। কেন না আমি জানি আমার শত্রু রয়েছে আমারই ভিতরে, আমারই বাইরে। আমার নিজেরই অনুভূতির যত আঁকাবাঁকা গতিপথ। যে সব অনুভূতিকে চিনতাম না, সেই সব অনুভূতি আমাকে শক্তিহীন করে ফেলেছে অনেক মুহূর্তে। আমার সেই রিক্ততার কথা, নরক যাত্রার বর্ণনা, আমার সেই নিহত হওয়ার কাহিনী কারুকে জানাতে পারলাম না। যদি কেউ জানতো! হায়রে!

এখন আমার মরতে হবে। মৃত্যু ছাড়া এখন আর অন্য কোন পথ দেখি না। ছোট আপার মতো অবস্থা আমার তো নয়। ছোট আপা শুধু ঘর বাঁধতে চেয়েছিলো, খুঁজে বেড়িয়েছিলো সেই সব মানুষকে। ও ঘৃণার পাথার পার পেরিয়েও হয়তো পেয়ে যাবে কোন ডাঙ্গা। আবার হয়তো ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু আমি? আমার যে ঘৃণার অবধি নেই। নিজেরই ওপর ঘৃণা হচ্ছে আমার। আমি এখন এই সাগরে ডুবে মরবো। এখন এ ছাড়া অন্য গতি দেখি না।

নিজেকে সুন্দর বলতে পারবো না। কোন দিন না। যদি আমি নিজেকে নিষ্কলুষ ভাবতে পারতাম!

না, মানুষের দেহ কলুষিত হতে পারে—এমন গোঁড়ামি আমার নেই। কোন শ্বাপদ যদি মানুষের ক্ষতি করে তাহলে আমি সেই মানুষকে দোষী করব কোন যুক্তিতে। আমার যত ঘৃণা সব যে এখন নিজেরই দুর্বলতার জন্যে। আমার প্রতিরোধের সব ক্ষমতা কেমন করে

সেদিন হারিয়ে গেলো সেই সময়! সেই ভয়ঙ্কর নগ্নতার কথা মনে পড়লে আমি এখন আর্তনাদ করে উঠি। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে যদি কাসেম খানের মুখটা দেখি কোন রাতে তাহলে চিৎকার করে উঠি।

সেদিন সেই সে সময় আমার অনুভূতিগুলোই আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আমার মনের চাইতেও শরীরটা হঠাৎ যেন বড় হয়ে উঠলো। আমি কেন হেরে গেলাম। এ শুধু বাইরে, বাইরে হেরে যাওয়া নয়। মনের ভেতরেও যে আমি হেরে বসেছিলাম একটা পশুর কাছে। যে পশুটা ছিলো আমারই ভেতরে লুকিয়ে। অথচ আমি কিছুই জানতাম না। এখন জেনেছি আর এই হার আমাকে এনে ফেলেছে ঘৃণার কূলহীন পাথারে। যা আমি কোন দিনই অতিক্রম করতে পারবো না।

কোন দিন আমি আর বলতে পারবো না আমি সুন্দর হতে চাই, আমি শুভ্র হতে চাই। কোন দিন আমি আর আনিসকে ছুঁতে পারবো না। এতকাল ধরে ভেতরে বাইরে এতো বাধার পাহাড় পার হয়ে এসে শেষ মুহূর্তে আমি আনিসকে হারিয়ে ফেললাম।

আমি জানি কেউ জানবে না ব্যাপারটা। হয়তো আমি আনিসকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে পারি। ও আমাকে হয়তো সারা জীবন বিশ্বাসও করবে। কিন্তু আমার এই একবারের নিহত হওয়ার কথা কেমন করে নিজের কাছে লুকিয়ে রাখবো? লুকিয়ে রাখলেও, সেই নিয়ত আত্মগোপনের প্রতিটি মুহূর্তে কি আমার বিন্দুতম সুখ-সাধকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো? আমার সুখ-সাধ সব যে মরে যাবে। সেই পরাজয় দিনে দিনে আমাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলবে। বার বার আমি হাত বাড়িয়েছি, অন্ধকার একটা ঘরের দরজা খুলে আলোকিত পথে বের হয়ে আসার জন্যে, আর বার বার কেউ যেন আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে সেই অন্ধকারেই। ফেলে দিয়েছে আর সশব্দে নিষ্ঠুর হাতে দরজা বন্ধ করেছে।

এই শক্তিকে নিয়তি বলবো না। ভাগ্য বলে মেনে নিতেও আমার বাধে। এ শক্তি আছে মানুষেরই ভেতরে। সেই লোভ সেই ঈর্ষা আর ঘৃণা মানুষকে ফাঁদ তৈরি করতে শিখিয়েছে। বাইরের জগৎটাকে সাজিয়ে তুলছে ইচ্ছে মতো। তারপর সেই বাইরের জগৎটাকে দেখেই মানুষ নিজে নিজে তৈরি হচ্ছে। নিজে তৈরি হয়ে সেই মানুষই আবার তৈরি করছে বাইরের পৃথিবীকে। আর সেই পৃথিবী আবার তাকে দুর্বল পেয়ে হত্যার দিকে, অন্ধকারের দিকে বারবার ঠেলে দিচ্ছে।

আমাকে বাঁচতে দেবে না ওরা। আমি বারবার চেষ্টা করলাম, আর ওরা বারবার ফিরিয়ে দিলো।

মা, মম, পুতুল, আনিস, রাহুল—এরা একে একে মরে যাবে সবাই।

আমি জানি, মা এবার মরবে। যে সন্তান এসেছে তার পেটে তাকেও মরতে হবে। মম পুতুল মরবে। আর মরবে আনিস। সুন্দর হয়ে বাঁচতে পারবে না ও। ও আবার ঘৃণার লোভের আর ঈর্ষার কাদায় গড়াগড়ি খাবে।

আমি সেই কুটিল ক্লেদাক্ত দিনের কথা মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ভুলতে পারবো না। মা বাবাকে হত্যা করেছে আর আমাকে হত্যা করলো এরা সবাই মিলে।

আমার এই যন্ত্রণার জীবনে নীল পাহাড়ের পাখির মতো এসেছিলো সুন্দর সাধের কটা দিন। সেই সাধের দিন-কটাকে আমি বুকে করে রাখতে চেয়েছিলাম—কিন্তু কেউ দিলো না তা রাখতে। কার কাছে আমি প্রতিবাদ করবো ? কে শুনবে আমার কথা ?

আমি শাসনের কথা জানি না। কাসেম খানের বিরুদ্ধে লড়ে আমি কিছু করতে পারবো না। আর কী নিয়ে আমি দাঁড়াবো ওদের বিরুদ্ধে। জন্ম থেকেই তো আমি একটা অস্থির পাহাড়ের চূড়োয় পা রেখেছি। টলমল করছি নিজেকেই দাঁড় করিয়ে রাখতে।

না, আমি কাঁদছি না। যা কাঁদবার সেদিনই আমি কেঁদে নিয়েছি।

আনিসকে এখন আমি কেমন করে মুখ দেখাবো। আমারই ভেতরে তখন কেউ বার বার করে বলবে, মঞ্জু তুই মিথ্যুক! সারা জীবন মিথ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তুই নিজেই মিথ্যুক হলি! আর যখন জানবে আনিস, তখন ওর সুন্দর শুভ্র মুখের ওপর ঘৃণা কেমন করে সহ্য করবো আমি। বিপদে পড়ে আমি আকুল হয়ে খোদাকে ডেকেছি। আমার সেই বিপদ, সেই সংকট খোদাকে ডেকেও কাটেনি। আজকের এই বিপদের দিনে কোন বিধাতা আমার পাশে এসে দাঁড়াবে।

এ বিপদকে তো বিপদ বলে মনে হয় না আজকাল। বিপদ বুঝবো তখনই যখন তার একটা সমাধানের পথ থাকে যে বিপদের পর সেই বিপদকে অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। আমার এই সময়ের চারপাশে তো এখন অতিক্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই, সমাধানের কোন পথ নেই। যে লোক চিরকালের জন্যে অন্ধকারের ভেতরে চলে গিয়েছে সে অন্ধকারকে আর অন্ধকার বলবে কেমন করে?

এর চাইতে বড় বিপদ আমার জীবনে আর কিছু হতে পারে না। এর চাইতে বড় কোন বিপদ মানুষের জীবনে আসতে পারে না। এখন কী নিয়ে বাঁচবো, নিজেরই বিশ্বাসকে যে আমি হারিয়ে ফেলেছি।

· পরকালের জন্যে আমি বাঁচতে চাই না। কী লাভ? নিজের বিশ্বাস হারিয়ে প্রেতাত্মার মতো বেঁচে থেকে কী লাভ!

মাঝে মাঝে একাকী ঘরে আমি চিৎকার করে উঠি। বার বার বলি, তোমরা আমাকে বাঁচতে দিলে না।

গতকাল আনিসের চিঠি এসেছে। আমি খুলিনি। সেই চিঠি হাত দিয়ে ছুঁতে এখন আমার সাহস হয় না। মনে হয় না আমার কোন অধিকার আছে।

হারালাম আমি। আমার সব কিছু হারালাম। আমার সাহস, আমার সাধ, আমার অধিকার—সব কিছু নিঃশেষে হারালাম।

নদী পার হবার সময় ব্রীজটা কেন জীপসুদ্ধ ভেঙে পড়লো না সেদিন।

উঃ সেই দিন কী ভয়ঙ্কর দিন!

শরতের সকাল ছিলো সেদিন। কিন্তু পরিষ্কার ঝকঝকে রোদ্দুর ওঠে নি। আকাশ ছিলো মেঘলা মেঘলা। আগের দিন তাজিনা জানিয়ে দিয়েছিলো, কাল সকালে যেতে হবে, তৈরী থেকো।

সকালে বেনু এলো। এসেই বললো, তাড়াতাড়ি নাও। আমি কাপড়-চোপড় পরে রাস্তায় নামবো, বেনু বাধা দিলো। বলে উঠলো পেছন থেকে, আহা তুমি যাচ্ছো কেন। ওরাই তো আসবে এ পথে।

এ পথে কেন, পলাশপুর তো ওদিকে।

হেসে উঠলো বেনু, আরে তোমার কি সম্মান নেই নাকি। তোমার জন্যে কাসেম খান তো কাসেম খান। রাজা মহারাজ পর্যন্ত সেধে সেধে দুয়ার পর্যন্ত আসতে পারে।

কথাটা বিশ্রী। কিন্তু আনন্দের এই দিনে ওর কথাটা আমলে আনলাম না।

একটু পর এলো ওরা। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে তুলু ভাবীর স্বামী মতিন সাহেব। ভদ্রলোককে আগে দেখিনি, আজ দেখলাম। মন্দ বয়স হয় নি। চুলে বেশ পাক ধরেছে! কাসেম সাহেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তুলু ভাবী স্বামীর পাশে বসে। ভেতরে এক পাশে তাজিনা আর বেনু পাশাপাশি বসলো। গাড়িতে ওঠার আগে একটু ইতস্ততঃ করলাম। মেয়েরা এক পাশে বসলেই বোধ হয় ভালো হতো।

তাজিনাই কথাটা তুললো। বললো, আরে বসো বসো। এখন অতো সঙ্কোচ করলে চলে না।

গাড়ি চলতে লাগলো। শহর ছাড়ালাম। কাঁচা রাস্তায় নামলো গাড়ী। বিষম ঝাঁকুনি লাগতে আরম্ভ করলো। আমি কেবলি চেপে

বসছিলাম একদিকে। কাসেম সাহেব আমাকে ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আরে পড়ে যাবে যে!

এদিকে একটা করে ঝাঁকি লাগছে আর তাজিনা হেসে উঠছে খিল-খিল করে। বেনুকে বলছে, ধরো আমাকে বেনুদা, পড়ে গেলাম যে।

বেনুদা ওকে ধরলে দু'হাতে জড়িয়ে। তাজিনার কাপড় এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। গোটা আঁচলটা লুটোচ্ছে পায়ের কাছে। বেনুর দু'হাত চেপে বসেছে ওর বুকের ওপর দিয়ে। কিন্তু মেয়েটার সেদিকে যেন লক্ষ্য নেই। পাগলের মতো হেসেই যাচ্ছে। আর থেকে থেকে এক একটা ঝাকুনির পর পরই বলে উঠছে, ধরো শক্ত করে, পড়ে গেলাম যে!

ওদিকে হুলু ভাবী আর মতিন সাহেবও হেসে হেসে সারা তাজিনার কাণ্ড দেখে। মাঝে দু' একবার বলে উঠলো, ওঃ মাই গুডনেস্!

ওরা সবাই যেন মজা পেয়েছে। কেবল আমারই অস্বস্তি লাগছে। আমার পিঠের ওপর দিয়ে ডান দিকে এসেছে কাসেম সাহেবের মোটা বেঁটে আর শক্ত হাতখানা। মোটা আঙুল ক'টা বুকের এক পাশে নড়ছে একটু একটু।

ওদের দিকে না দেখে উপায় নেই। মুখোমুখি বসেছি। বাইরের দিকে তাকাতে পারছি না। আর যত বার দেখছি, ততবারই গা-টা রি-রি করে উঠছে। এ কী সর্বনাশা আনন্দ ওদের।

কাসেম সাহের ধীর স্থির। যেন কিছুই ঘটে নি। মনে মনে কি যেন ভাবছে লোকটা। তাজিনা আর বেনুকে বললো, তোমাদের ওজন যদি আমার মতো হতো তাহলে এতো ঝাঁকি লাগতো না। মতিন, জোরে চালাও।

গাড়ির গতি বাড়লো আরো। মেঠো রাস্তায় গাড়ি লাফিয়ে উঠছে থেকে থেকে। আর মেয়েটার হাসি যেন ফুরোতে চায় না। দু'হাতে বেনুর গলা জড়িয়ে ধরে বলছে, আরো জোরে চালাও, দেখি কতো স্পীডে চালাতে পারো।

'গাড়ির গতি বাড়লো আরো। দু'পাশের গাছপালা যেন চোখের সম্মুখে চমকে উঠতে লাগলে। পেছনে ধোঁযার পুঞ্জ।

' লাইফ ইজ এ টেরিব্‌ল স্পীড, কাসেম সাহেব চেঁচিয়ে উঠলো। তারপব বললো, উই আব এনজযিং আওয়ার সেলভ্‌স। নো ফর্মালিটিজ নাউ। উই আর এ্যাজ ইনোসেণ্ট এ্যাজ চিলড্রেন, গোযিং ব্যাক টু আওয়ার গুড ওল্ড ডেজ। কথা কটা বলে আমাকে কাছে টানতে চেষ্টা করলো। আমি হাতটা ছাড়িযে নিলাম। রাস্তাটা যে কতক্ষণে শেষ হবে!

ওদিকে তাজিনা বেনুর কাঁধে মাথা রেখে ওকে জাপটে ধরে রয়েছে। গাড়িখানা বুনো মোষের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হযে ছুটছে।

কেবল হাসি আব হাসি। তার সঙ্গে ঝাঁকুনি। রাস্তা ক্রমেই নিচুতে নামছে। বাস্তা তো নয, ধাপের পব ধাপ নেমে আমবা যেন নবকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমার তখন ভয ধবেছে মনে। ভযঙ্কব একটা আশঙ্কা হচ্ছে সময সময। মাঝে মাঝে আবাব বাইরে দিনের আলো দেখে সাহস ফিরে আসছে মনে। এতোগুলো লোক আছে সঙ্গে, কেউ নিশ্চযই বিশ্রী কিছু কবতে সাহস কববে না। তবু একেক বার ইচ্ছে কবছে ওদের বলি, আমাকে নামিযে দাও, আমি ফিরে যাই। কিন্তু তখন যে সে কথাও বলা যায় না।

হঠাৎ গাড়ির গতি থেমে গেলো। আর সেই ঝাঁকুনিতে আমি গিযে পডলাম কাসেম খানের ওপর। লোকটা আমাকে এবার দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। আর সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো মতিন সাহেবের উদ্দেশ্যে, ওযেল ডান মাই বয়। ইটস্‌ ইযোর ডে।

ও মাগো! অস্ফুট চেঁচিযে উঠেছে তাজিনা সেই ধাক্কায়। ধাক্কাটা সামলে না উঠতেই গাড়িটা আবার প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করলো।

আমার দু'কান ঝাঁ ঝাঁ করছে তখন। জোর করে নজর ফিরিয়ে রাখলাম। বুকের ভেতরে ভয় আর বিশ্রী একটা উত্তেজনা অনুভব

করলাম। কেমন করে দেখা যায় তাকিয়ে। বেনু আর তাজিনা এমন বিশ্রী রকমের এলোমেলো যে তাকিয়ে দেখা যায় না। আমার ভীষণ ঘেন্না. হচ্ছে তখন মেয়েটার ওপর। মনের ভেতর থেকে কেউ যেন বলে উঠলো, ছি ছি মেয়েটা এমন কেন?

এবার মরিয়া হয়ে বলে উঠলাম, বেনুদা তোমরা আমাকে নামিয়ে দাও। গাড়ি থামাও।

বোধ হয় জোরেই বলে উঠেছিলাম কথাটা। গাড়ির গতি হঠাৎ থেমে গেলো। সবাই এক সঙ্গে প্রশ্ন করলো, কি হয়েছে? সবাই আমার দিকে ফিরে দেখলো। তারপর সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলো সকলে। আমি খুব হাস্যকর কোন রসিকতা করে বসেছি যেন।

ওদের হাসি থামলে মতিন সাহেব বলে উঠলেন, এই তোমরা এমন ছেলেমানুষী করছো কেন। দেখো না মেয়েটা এ সব দেখতে অভ্যস্ত নয়। ওর হয়তো খারাপ লাগছে।

কেন খারাপটা কোথায়? কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ করে ফেলেছি – তাজিনা মুখিয়ে উঠলো।

মতিন সাহেবের চোখে মুখে বিচিত্র একটা হাসি খেলে গেলো। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। এ সব দেখতে মতিন সাহেবও অভ্যস্ত। এখন শুধু আমার জন্যেই কথাটা বললেন। ভদ্রলোক তবু বললেন, চেঁচামেচিটা কম করলেই তো হয়।

তাজিনা অসহিষ্ণু গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, হয়েছে হয়েছে, আপনি পেছনে তাকাবেন না। গাড়ি চালান।

আমার দিকে তাকিয়ে বললো—এই মঞ্জু অমন মুখ গোমড়া করে কেন। পিকনিকে যাচ্ছো, একটু হাসিখুশি না থাকলে পিকনিকে এসে কি লাভ। বাড়িতে বসে থাকলেই তো হতো।

একটু ছেলেমানুষী মন্দ কি! ঝুলু ভাবী মন্তব্য করলো। বললো, ওর আবার একটু বেশি বেশি সব ব্যাপারে।

আমার সারা গা হিম হয়ে গেছে। এই কি ছেলেমানুষী নাকি! এ নোংরামির নাম ছেলেমানুষী!

আমি ডেকে বললাম, মতিন সাহেব, গাড়ি থামান। আমি নামবো।

নামবে! মতিন সাহেব অবাক হলেন যেন। বললেন, এখানে কোথায় নামবে? এই তো এসে গেলাম। আর একটু সময়।

কতক্ষণ? তাজিনা প্রশ্ন করলো।

মিনিট চল্লিশ, গীয়ার বদলাতে বদলাতে উত্তর করলেন মতিন সাহেব।

এতো শীগ্‌গির রাস্তা ফুরিয়ে গেলো! আপনি বেশি স্পীডে গাড়ি চালিয়েছেন, তাজিনা আফসোস করলো।

তাজিনা আবার গলা জড়িয়ে ধরেছে বেন্নুর। দু'জনের মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে। রাস্তাটা কিছু দূর পর্যন্ত ভালো ছিলো একটু পর আবার সেই খারাপ রাস্তা। আবার ঝাঁকুনি। সেই সঙ্গে হাসি আর আদিম সেই উল্লাস। গাড়ি এপাশে ওপাশে ঝাঁকি খাচ্ছে তখন ক্রমাগত। কাসেম খান আমাকে জড়িয়ে ধরেছে বুকের কাছে। আমি ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা কবছি। ওদিকে ওরা সবাই আমার দিকে তাকিযে দেখছে, তুলু ভাবী পর্যন্ত। দেখছে আর ভারী মজার হাসি হাসছে।

কাসেম খান ওর ঠোঁট ছোঁয়ালো আমার কাঁধের ওপর। জোঁকের মতো মোটা মোটা থলথলে দুখানা ঠোঁট। শিউরে উঠলাম। ঘেন্নায় সারাটা শরীর বিজবিজ কবে উঠলো। মোটা হাতখানার বাঁধন থেকে. নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করছি। কিন্তু পাবছি না কোনমতেই। তাজিনা সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো, কাসেম, দিস টাইম য়্যু হ্যাভ ইট অর লুজ ইট ফর এভার।

আমি মাথা নিচু করে রেখেছি আর কাসেম খান বাম হাতে আমার চিবুক তুলে ধরতে চেষ্টা করছে। কী প্রচণ্ড শক্তি লোকটার। জোর করে মাথা নামিযে রেখেছি। এদিকে গাড়িটাও ক্রমাগত ঝাঁকি খাচ্ছে। আমি পারছি না দৈত্যটার সঙ্গে। তখন সজোরে ওর ডান হাত কামড়ে ধরলাম।

কাসেম খান অস্ফুট আর্তনাদ করে ছেড়ে দিলো আমাকে।

কী হলো? সবাই ফিরে তাকিয়েছে তখন। গাড়িটা ঝাঁকি দিয়ে থেমে গেলো।

কিছু না, কিছু না, হাসতে হাসতে কাসেম খান বললো, দ্য ওয়াইল্ড ক্যাট হ্যাজ বিটেন মি।

তাজিনা খিল খিল করে উঠলো কাসেম খানের অবস্থা দেখে। বললো, দেন য়্যু মাস্ট হ্যাভ হার। য়্যু নো হাউ টু টেম ওয়াইল্ড ক্যাট্স।

ও ইয়েস আই নো, এণ্ড আই মাস্ট ডু ইট।

গাড়ি চললো আবার। আমি মাথা নিচু করে রেখেছি। একবার চেঁচিয়ে উঠলাম, গাড়ি থামাও, নইলে লাফিয়ে পড়বো গাড়ি থেকে। কাসেম আমার দুটো হাত চেপে ধরেছে শক্ত করে। গাড়িটা ছুটে চলেছে উঁচু নিচু রাস্তার ওপর দিয়ে। ওরা মাঝে মাঝে হেসে উঠছে এখনো। যেন কিছুই ঘটেনি। এ রকম ঘটনা যেন হরদমই ঘটে ওদের কাছে। দেখলাম আর উপায় নেই। চুপ করে বসলাম। ভীষণ কান্না পাচ্ছে তখন আমার। একেকবার ভাবছি লোকটার গায়ে কী ভীষণ জোর। কাসেম খান এক সময় আমার হাত দুটো ছেড়ে দিলো। কিছু পর বললাম, আপনি আমার বাপের বয়সী, যদি জানতাম আপনি এ রকম লোক তাহলে আমি কখখনো আসতাম না।

কাসেম খান হো হো করে হেসে উঠলো। সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো, আরে বাপু তোমার বয়সী হলে এতো পয়সা খরচ করতাম নাকি? বাপের বয়সী বলেই তো এতো পয়সা খরচ করেছি।

আমি বেনু আর তাজিনার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। আমি তখন বুঝে ফেলেছি। কেন ওরা আমায় পিক্‌নিকে আনার জন্যে এতো উৎসাহী হয়ে উঠেছিলো। দুলু ভাবীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। সে আমার দিকে পেছন ফিরে একবারও তাকিয়ে দেখছে না।

বেন্টু আর তাজিনা চুপচাপ বাইরে মুখ ফিরিয়ে বসে রয়েছে। যেন এই বিশ্রী ঘটনাটা এই নিষ্ঠুর আর নোংরা ব্যাপারটা কিছুই নয়।

গাড়ি থেমে গেলো। আর কি আশ্চর্য। গাড়ি থেকে টপটপ করে নেমে একে একে ছুটে গেলো ওরা সবাই। পেছনে তাকিয়ে দেখলো না পর্যন্ত। আমি নামতে গেলাম। দেখি কাসেম খান হাত ধরে রেখেছে। আস্তে করে বললো, আমি তোমায় নামিয়ে নিয়ে যাবো।

আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জোর করে নিজেই নামতে যাবো। পারলাম না। কাসেম খান তার লোহার মতো শক্ত দুই হাতে আমাকে বুকের কাছে টেনে আনলো। আমার তখন দম বন্ধ হয়ে আসছে। দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছি। প্রচণ্ড যুদ্ধ করছি। কাসেম খানের বীভৎস মুখখানা ক্রমেই নেমে আসছে আমার মুখের ওপর। এক সময় আমার সব জোর ফুরিয়ে এলো। আর পারলাম না। কাসেমের সেই কালো মোটা ঠোঁট দুটো আমার সারাটা মুখ আবিলতা আর ঘেন্নায় ভরে দিলো।

কাসেম যখন আমায় ছেড়ে দিলো তখন আমি কাঁদছি। না, কোন কথা বলছি না। আমার সারা গায়ে তখন কাদা, সারা মুখের ভেতরে রাশ রাশ থুথু। দু'চোখে শুধু ঝাপসা কান্না। কিন্তু করার কিছু নেই আমার। পাথরের মতো গাড়িতে বসে থাকলাম। অদূরে ডাকবাংলো থেকে খুশির চিৎকার ভেসে এলো। তাজিনার গলা শুনলাম।

ঘেন্না আর কান্না ছাপিয়ে আরেকটা কী যেন অনুভূতিতে ঘোর লেগেছে তখন আমার। কিংবা আসলে সেটা কোন অনুভূতিই নয়। আমি যেন তখন আর আমি নেই। সেইভাবে বসে থাকতে থাকতেই এক সময় আমার কান্না থেমেছে। এখন মনে হয় সেই প্রাণহীন নিরনুভব দেহের মধ্যে যেন আরো কিছু ছিলো যা আমার সব অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো।

সেদিন সেই নরক যাত্রার শেষ হয়েছিল। ভেবেছিলাম ওদের কৌতুকের এখানেই শেষ। মনে হয়েছিল, ওদের হৈ-হুল্লোড়ের এখানেই

শেষ। লোকের হাতে টাকা পয়সা থাকলে কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল হয়—ওদেরও তাই হয়েছে। কাসেম খান এখন ওদের সঙ্গে কিছু ঠাট্টা-মস্করা করবে, খাওয়া-দাওয়া হবে, তারপর আবার শহরে ফিরে যাবে।

গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। সম্মুখে ডাকবাংলো। মস্ত এক আম বাগানের এক পাশে। পেছনে কাছেই নদী। ওরা ক'জনা ছুটোছুটি করছে বাচ্চা ছেলেমেয়ের মতো। মতিন সাহেব ভুলু ভাবী পর্যন্ত এক ঝাঁক প্রজাপতির পেছন পেছন ছুটছে।

এক সময় ভুলু ভাবী প্রস্তাব করলো, চলো চলো আমরা লুকোচুরি খেলি।

ওদের দেখলে মনে হবে সবাই যেন শৈশবে ফিরে গিয়েছে। পরিণত বয়সের কয়েকজন মানুষ হঠাৎ একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে উঠতে চাইলো। একবার বেনু গায়ের উপর একটা গাং-ফড়িং ছেড়ে দিয়ে ভুলু ভাবীকে খুব নাকাল করলো। সবাই হো হো করে হাসলো। আমারও হয়তো হাসি পেতো অন্য কোথাও হলে। এখানে হাসতে পারলাম না। কেন না কী রকম যেন ভয় ভয় আশঙ্কা বুকের ওপর চেপে ছিলো। আমি লক্ষ্য করে দেখছিলাম বেনুর দিকে। তাজিনার দিকে—সত্যি সত্যি শিশুর মতো সরল আর স্বাভাবিক মনে হচ্ছে কি না ওদের। দেখলাম বার বার করে। মম পুতুলকে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছি। আমি কতোবার আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে। ওরা যখন নিজে নিজে কোন ভাবনায় মগ্ন হয়ে যায় অথবা কোন কৌতুকের খেলায় দুরন্ত ছুটোছুটি করে আর হাসে, তখন ওদের আশ্চর্য পবিত্র মনে হয়েছে।

মিলিয়ে দেখলাম আমার সহযাত্রীদের। এদের তো তেমনি মনে হচ্ছে না। কেমন করে মনে হবে। ওরা বারবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখছে। কি যেন লক্ষ্য করছে। আর আমার মনে হলো সেই মুহূর্তে ওদের এই লুকোচুরি খেলায় যেন আমি যোগ দিই এক সময় সহজ ভাবে, তেমনি একটা আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছে।

ওদের এমনি আমন্ত্রণ যদি খোলাখুলি হতো, তাহলে হয়তো আমার ভালো লাগতো। কিন্তু আমার চোখে যে ধরা পড়লে অন্য চেহারা। আমি যে ওদের লক্ষ্য করে দেখছি। এ ব্যাপারটা কারুর চোখ এড়ালো না। ওদের সবার চাপা ঠোঁটের নিচে, চিবুকের ভৌলের আড়াল দিয়ে, দেখলাম কুটিল কী একটা অভিসন্ধি ফুটে বেরুচ্ছে।

লুকোচুরি খেলা, কিংবা এই যে সহজ ছেলেমানুষী করার ভান, এটা আর কিছু নয়, বিবেকের সম্মুখে মুখোশের আড়ালে লুকনো। কিংবা তাও নয়। ওদের কি বিবেক বলে কারুর কিছু আছে? আসলে এটা ভান। সবাই জানে ভান—আসলে অন্য কোন উদ্দেশ্য লুকনো রয়েছে আর সেই উদ্দেশ্যটাও ওদের সবার জানা।

চলো আমরা সবাই বাইরে ছড়িয়ে পড়ি।

হ্যাঁ, তাই চলো। ঘরের ভেতরে বিশ্রী গরম।

তোমাদের কি মত বেনু? কাসেম খান জিজ্ঞেস করলো, সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়ে।

হ্যাঁ, সবাই রাজী আমরা। চলো বাইরে যাই।

তুমি দৌড়তে পারো তো? কাসেম খান আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো।

আমি কোন জবাব দিলাম না। কাসেম খান পাশ থেকে উঠে চলে গেলো বাঙলোর ভেতরে।

তাজিনা ধাক্কা মেরে বললো, কথার জবাবটা তো দিতে পারতে। একটু ভদ্রতাও শেখোনি।

আমি এ কথারও কোন উত্তর দিলাম না।

ওর হয়তো খারাপ লাগছে। ওকে বিশ্রাম করতে দাও। কাসেম খান পেছন থেকে বললো। লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। খাবারের ঝুড়ি নিয়ে এসেছে হাতে করে। ওরা হাতে হাতে তুলে নিলো স্যাণ্ডুইচ আর কলা। আমার হাতে তুলে দিলো ডুলু ভাবী। আমি নিলাম না। কাসেম খান হেসে উঠলো, এখনো রাগ পড়ে নি দেখছি।

তাজিনা পাশ থেকে বলে উঠলো, আচ্ছা কী এমন হয়েছে যে এমনি হয়ে থাকতে হবে? হাসি-ঠাট্টা মানুষে করে না! আর আমরাই তো সবাই। বাইরের তো কেউ নেই আর।

আমি তখনো কিছু বললাম না। বারান্দার রেলিঙের দিকে উঠে গেলাম। বাইরে অজস্র রোদ। বেলা দুপুর হয়েছে নিশ্চয়ই। দূরে কি একটা পাখি অনেকক্ষণ ধরে ডাকছে। চারপাশ দিয়ে এলোমেলো হাওয়া বইছে। পেছনে ওরা আবার হৈ-হৈ করে উঠলো আরেক প্রস্থ।

কিছুক্ষণ পর ওরা সবাই ছড়িয়ে পড়লো বাইরে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে। ওদের চলাফেরার ভঙ্গী দেখে মনে হলো ওরা এ জায়গাটার সঙ্গে বহুদিন ধরে পরিচিত।

দুলু ভাবী আর কাসেম খান এক ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছে। ঘাসের উপর উবু হয়ে শুয়ে পড়েছে দু'জনে। বেনু খুঁজে বার করলো তাজিনাকে। তাজিনা ছুটে চলে গেলো অন্য দিকে। ওদের হাসির শব্দ কানে এলো। এপাশ থেকে ওরাও হেসে উঠলো। দেখলাম দুলু ভাবীর বুকের উপর মাথা রেখে কাসেম খান চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে।

আমি ফিরে এসে বসলাম। এর নাম খেলা? এরা এমনি করার জন্যে ছেলেমানুষীর ভান করে।

বাঙলোর বারান্দায় বসে রইলাম। মেঝেতে জিনিসপত্র একাকার করে ছড়ানো। কাসেম খান তার ট্রানজিস্টার জুড়ে গিয়েছে। কোন এক বিদেশী ভাষায় গান হচ্ছে।

আমি তখনো স্বাভাবিকতা ফিরে পাই নি। কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব ঘিরে ধরেছে সারাটা দেহ। মাথার ভেতরে কোথায় যেন ঝিম ঝিম করছে। একেকবার মনে হচ্ছে বোধ হয় বমি করবো।

চারপাশ থেকে তখন ওদের কলকণ্ঠ হাসির ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। ট্রানজিস্টারের গানের শব্দ ছাপিয়ে ওদের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

আমি ব্যাকুল চোখে তখন কাউকে খুঁজছি। তখন খুঁজছিলাম যে

কোন একটি মানুষ। যার কাছে আমি আশ্রয় নিতে পারি। কিন্তু সে জায়গার চারপাশে একটি মানুষ দেখতে পেলাম না, দূরে অদূরে কোন ঘর-বাড়ির চিহ্ন দেখলাম না। যতোবার দেখতে চেষ্টা করলাম, ততবারই শুধু চোখে পড়লো আম গাছের ডালপালা আর তারও পেছনে ঘন আসামী ঝাড়ের জঙ্গল। তার মাঝে যদি বা নতুন কিছু চোখে পড়ছে তা হলো দুলু অথবা তাজিনার ছুটোছুটি করতে থাকা রঙীন কাপড়ের চকিত উল্লাস। নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হতে লাগলো।

কিন্তু কে জানতো সেই অসহায়তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু লুকিয়ে ছিলো আমার অপেক্ষায়। ওরা সবাই শিশুর মতো অবোধ খেলায় মেতে উঠেছে আর আমি এদিকে বারান্দায় সব অনুভূতি নিঃশেষ করে বসে রয়েছি।

আমি সেখান থেকেই দেখলাম। এক সময়, তাজিনা বেনুকে নদীতে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলো। দুলু ভাবী মতীন সাহেবকে। তারপর সেই কাদামাখা কাপড়-জামা ভেজা দুটো মানুষ মেয়ে দুটোকে ছুটে এসে ধরলো। তারপর ওদের তুলে নিয়ে নেমে গেলো নদীর পানিতে। একটু পর আর দেখতে পেলাম না কাউকে।

ঘরের ভেতরে হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো। পর্দাগুলো উড়ছিলো সেগুলো এখন স্থির। আমি ওদের হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার কোন কৌতূহল ছিলে না। কোন অনুভূতি ছিলো না। বুঝতে পারছিলাম না কোথায় এসেছি, কিসের জন্যে এভাবে বসে রয়েছি। মনের ভেতরটা তখন লতাপাতা-গাছপালা ভরা এই অরণ্যের মতোই হয়ে পড়েছিলো হয়তো। না, কোন মানুষের কথা মনে পড়ে নি।

এখনও বুঝতে পারি না, আমি কেন সব বোধ হারিয়ে ফেলেছিলাম। কেন আমার শক্তি বিমূঢ় হয়ে পড়েছি সেদিন।

কতোক্ষণ জানি না। হঠাৎ আমার কাঁধে কার হাত এসে পড়লো। না, চমকে উঠিনি। আমার মন বলছিলো, হয়তো আমার নিজেরই

অজ্ঞাতে, যে এ রকম যে কেউ এসে আমার কাঁধে হাত রাখবে। সেই মোটা হাতের বেঁটে বেঁটে আঙ্গুলগুলো আমার চেনা হয়ে গিয়েছে।

এসো, ঘরের ভিতরে যাই, খসখসে উত্তেজিত স্বর লোকটার।

আমি শক্ত হয়ে বসলাম। রেলিঙ চেপে ধরে।

আমার উপর রেগে আছো কেন? বলো, কি লাভ ওতে। আমি তো আর কোন দিন তোমায় আনতে যাবো না। আর তুমি যে এখানে এসেছো এটাই বা কয়জনে জানে। এসো, লজ্জা কিসের?

আরো কি কি যেন বলেছিলো কাসেম খান। লোকটা কথা বলছিলো আর আমার গায়ে জ্বালা ধরছিলো একটু একটু করে। তবু আমি কিছু বলছিলাম না।

তুমি কি মনে করো তোমার ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি?

কাসেম খানের এই প্রশ্নে চমকে উঠলাম। ফিরে তাকালাম লোকটার মুখোমুখি। কি বলতে চায়।

আমি জানি আনিসের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক। যদি মনে করো আমাদের সঙ্গে এসে নিজের মতো থাকবে, তাহলে কি পার পাবে ভেবেছো? আনিসকে জানিয়ে দিতে কতোক্ষণ। আর একবার আনিস জানতে পারলে তোমার এই অহঙ্কারটা কোথায় থাকবে?

না, না, আমি পারবো না। আমি পাগলের মতো চিৎকার করে উঠেছি।

আনিসকে তাহলে জানাবো যে এখানে এসেছিলে তুমি আমার সঙ্গে। একটা দিন থেকে গিয়েছো।

আমি কি করবো এখন? ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলাম। শরীরে মনে আর এতটুকু শক্তি নেই তখন আমার। মনের সব চাইতে শক্ত জায়গায় আঘাত খেয়ে আমি হেরে গেলাম। কাসেম খান আমার হাত ধরে টেনে তুলতে গেলো, আমি ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইলাম হয়তো। শরীরের সমস্ত শক্তি গলায় এনে চিৎকার করে উঠতে চাইলাম।

তারপর জানি না, আমি কোথায় গেলাম। শেষ মুহূর্তে মনে হয়েছিল

কেউ যেন বারান্দায় ছুটে এসেছিলো। খুব সম্ভব বেনু ছুটে এসেছিলো বাধা দিতে। সেও আমার দুঃস্বপ্নের মাঝখানে মুহূর্তের জন্যে দেখা। তারপর এক নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেলাম। 'বাঙলোর সেই সময়ের ছবিটা আমার কাছে এখন ঝাপসা। কখন যে সেই ঘরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো বলতে পারবো না। চোখের সম্মুখে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ হলুদ হলুদ অন্ধকার দেখছি। আর সেই অন্ধকার দেখতে দেখতে, ঘাম আর পাশব এবং হিংস্র নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে শুনতে, তীক্ষ্ণ এবং তীব্র একটা যন্ত্রণার ছুরি দিয়ে কেউ যেন আমার অস্তিত্বের কেন্দ্র থেকে আমাকে আলাদা করে ফেললো। আমি শেষবারের মতো চিৎকার করে মরে গেলাম।

আবার আমি জেগে উঠেছিলাম। এবং জেগে উঠে নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনেছি। নিজের শরীরটাকে অনুভব করেছি। কি আশ্চর্য, শরীরটা আমার মরে গেলো না। সেই না-আলো না অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমার মৃত্যু হ'ল। বেঁচে থাকলো শুধু শরীরটা।

কী করবো আমি। ভাবতেও এখন আমার ভয় করে, সেই ভয়ঙ্কর দুপুরের কথা। কাউকে জানাতে পারছি না।

আমার বাঁচবার কতো সাধ ছিলো। এই সাধটাকে কতো কষ্টে কতো যত্নে কতো গোপনে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলাম। কতো কান্না, কতো অপমান, কতো স্নিগ্ধ-সুখের স্মৃতি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। সেই সাধটা আমার মরে গেলো।

এখন বাঁচবো কোন সাহস নিয়ে। শক্ত পায়ে দাঁড়াবো কোন বিশ্বাসের ওপর। কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো। হায়রে! আর আমি আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারবো না, আর আমি গাছপালার সহজ রঙকে আপন বলে ভাবতে পারবো না, আর আমি কোন দিন আনিসের জন্যে অপেক্ষা করতে পারবো না।

লোভ লোভ, ঘৃণা ঘৃণা, কান্না আর কান্না। আর সব মিলিয়ে বিশ্রী